প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

একাদশ বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● জানুয়ারি-জুন ২০২১

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জানুয়ারি-জুন ২০২১

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, *প্রথম আলো*

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; প্রধান নির্বাহী, নলেজ অ্যালায়েন্স

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ১০০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
January-June Issue, 2021; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 100 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ৬

রা জ নৈ তি ক অ র্থ নী তি

সরকারের অপচয় : রাজনৈতিক অর্থনীতি ৯
আকবর আলি খান

রা জ নী তি

বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদ : কারণ ও পথরেখা অনুসন্ধান ২৯
আলী রীয়াজ

আ ন্ত র্জা তি ক

গ্যারিসন রাষ্ট্র এবং গণহত্যা : রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ৫১
মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সহিংসতা
নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

স মা জ

‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ এবং বাংলায় ইসলাম প্রসারের তরবারিতত্ত্ব ৭৭
আলতাফ পারভেজ

স মা জ

আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি ১০৫
সমাজের পরিবর্তন এবং এর প্রভাব
হাফিজুর রহমান কার্জন

দ লি ল প ত্র

মোগল সম্রাট কর্তৃক ঢাকায় নির্বাসিত এক রাজকুমার কবির খান খান্দেশি ১২৯
মোহাম্মদ আবুল বাশার

লেখক পরিচিতি ১৩৭

প্রতিচিন্তার এই সংখ্যা সাজানো হয়েছে রাজনৈতিক অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক, সমাজ ও ঐতিহাসিক দলিলপত্রের সম্মিলনে। এর উদ্দেশ্য হলো সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখে জানা-অজানা বিষয়গুলো নতুন করে সামনে আনা। এর মাধ্যমে সমকালীন বাংলাদেশকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সরকারি টাকার অপচয় নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। বিভিন্ন প্রকল্পে অপব্যয়, জনগণের টাকার অপব্যবহার, প্রয়োজনহীন প্রকল্প প্রণয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারি টাকার অপচয়ের ঘটনা নতুন নয় এ দেশে। বস্তুত অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশনির্বিশেষে সবখানেই সরকারের অপচয়ের মাধ্যমে জনগণের অর্থের অপচয় হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে গণমাধ্যমে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়ে থাকে। এর ফলে বিষয়গুলো সবার কাছেই কমবেশি পরিচিত। এসব ঘটনা ঘটার পেছনে কাজ করে রাজনৈতিক অর্থনীতি। বিষয়টি উঠে এসেছে আকবর আলি খানের লেখায়। যে হারে সরকারে অপচয় হয়, সে তুলনায় এ বিষয়ে গবেষণা কম। বস্তুত বিষয়টির গ্রহণযোগ্য কোনো সংজ্ঞাও এখন পর্যন্ত নেই। এ প্রবন্ধে সরকারি অপচয়ের মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি এর সমাধান খুঁজে বের করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদ সারা বিশ্বেই একটি বেদনাদায়ক বাস্তবতা। বাংলাদেশেও এই বাস্তবতা বিদ্যমান। জঙ্গিবাদের সূচনা আগে হলেও ২০০০ সালের পর থেকে এ দেশে ইসলামকে ব্যবহার করে জঙ্গিবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বাংলাদেশ সরকার সে সময় জঙ্গিবাদ কঠোর হাতে দমন করলেও এর রেশ রয়ে যায়। জঙ্গিবাদী দলগুলোর উচ্চপর্যায়ের নেতাদের বিচারের মাধ্যমে জঙ্গিবাদের বিদ্যমান নেতৃত্বে ধস নামানো গেলেও পুরোপুরি বিনাশ করা যায়নি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড থেকে। এই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নতুন এক পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার পতনের পর

বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে ঘৃণ্য যে জঙ্গিগোষ্ঠী জেঁকে বসেছে, তার নাম ইসলামিক স্টেট। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ঢাকায় জঙ্গি হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দেয় ইসলামিক স্টেট। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এ দেশে ইসলামিক স্টেটের উপস্থিতি নাকচ করে দেয়। এই ঘটনাকে স্থানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর নাশকতা বলে সরকার বিবৃতি দেয়। এই বিবেচনায় বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদের পরিস্থিতি তুলে ধরার মাধ্যমে এর কারণ ও ভবিষ্যৎ খতিয়ে দেখা দরকার। আলী রীয়াজের লেখায় এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জঙ্গিবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক ইসলামের একটি ধারার সম্পৃক্ততা থাকায় ধর্মের সঙ্গে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক প্রায়ই আলোচনায় আসে। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যাবে এই লেখায়।

২০২১ সালের শুরুতেই মিয়ানমারে আবারও ঘটে গেল সামরিক অভ্যুত্থান। মিয়ানমারে এক দশক ধরে বেসামরিক নেতৃত্বের অধীনে ত্রুটিপূর্ণভাবে হলেও গণতান্ত্রিক উত্তরণের যেটুকুই চেষ্টা ছিল, তারও অবসান হলো। মিয়ানমারের রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে সশস্ত্র বাহিনীর প্রোথিত অবস্থা এর মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হলো। মিয়ানমারের সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে সামরিক বাহিনী বা তাতমাদো দেশটিকে সামরিকায়ন করেছে। এর অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দল ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকেও বাধ্য করেছে সামরিকায়নের অংশ হতে। গ্যারিসন রাষ্ট্রে এসব বৈশিষ্ট্য থাকে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। গ্যারিসন রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কল্পিত নিরাপত্তা হুমকি। এর মাধ্যমেই সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা জায়েজ করা হয়। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর পরিচালিত গণহত্যা এবং জাতিগত নির্মূল অভিযানের কারণ খুঁজতে গেলে তাই গ্যারিসন রাষ্ট্রের ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। গ্যারিসন রাষ্ট্র, গণহত্যা এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সহিংসতা নিয়ে তাই নিলয় রঞ্জন বিশ্বাসের একটি নিবন্ধ ছাপা হলো।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কারণ ও ভবিষ্যৎ দেখতে গেলে এ দেশে ইসলামের বিস্তারের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাংলায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়া বিষয়ে অনেকগুলো বয়ান রয়েছে। এর মধ্যে গভীর গবেষণালব্ধ কিছু প্রামাণিক আলোচনাও রয়েছে। বিভিন্ন আর্থসামাজিক বিষয়কে পাশ কাটিয়ে শক্তির জোরে বা তরবারির মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের পক্ষেও অনেকের অবস্থান রয়েছে। বাংলা ভাষার অন্যতম বিখ্যাত কবি আল মাহমুদের জনপ্রিয় কবিতাগুলোর মধ্যে একটি হলো 'বখতিয়ারের ঘোড়া'। এই কবিতায় যোদ্ধা বখতিয়ার খলজিকে মহিমান্বিত করার মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তাঁর অবদানের কথা বিধৃত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আল মাহমুদকে উপলক্ষ করে আলতাফ পারভেজ বাংলায় ইসলাম প্রসারের আলোচনা এগিয়ে নিয়েছেন। তবে এই কবিতা আল

মাহমুদের কবিসত্তার পরিচায়ক নয়। এই কবিতা দিয়ে তাঁকে বিচার করাও যুক্তিসংগত নয়। কারণ, কবি হিসেবে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে মানবতাকে উচ্চাসীন করার ইতিহাস তাঁর রয়েছে। কিন্তু এই আলোচনায় শুধু 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কবিতায় বর্ণিত তাঁর বয়ানের সঙ্গে বাংলায় ইসলাম প্রসারের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় তুমুল গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ও চিন্তনপ্রতিষ্ঠানগুলো যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তার চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে আছে বাংলাদেশের উন্নয়নের অর্জন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠির সঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য নিঃসন্দেহে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু এর পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে সব মহলেই রয়েছে আফসোস ও হতাশা। কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক গন্তব্যে পৌঁছাতে না পারার ব্যর্থতা সর্বজনস্বীকৃত। এ বিষয়েও রয়েছে বিস্তর আলোচনা। কিন্তু বাংলাদেশে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের যাত্রাপথে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেগুলোর কী ধরনের প্রভাব এ দেশের সমাজ, রাজনীতি ও মূল্যবোধের ওপর পড়েছে, সে নিয়েও আরও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। রাজনৈতিক দৈন্য, দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিষয়গুলো ব্যতিরেকে বাংলাদেশের এই উন্নয়নযাত্রার আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। সে লক্ষ্যে হাফিজুর রহমান কার্জনের এ বিষয়ক একটি নিবন্ধ ছাপা হলো।

মধ্যভারতের খান্দেশ রাজ্যের রাজপুত্র কবির খান খান্দেশি অনেকের কাছেই অপরিচিত নাম। চরিত্রটি নিয়ে *প্রতিচিন্তা*র এই সংখ্যায় লেখা ছাপানোর উদ্দেশ্য হলো, ঐতিহাসিক একটি সময়ের প্রেক্ষাপট সামনে আনা। মোগল সম্রাট আকবর মধ্যভারতের খান্দেশ নামক রাজ্য দখল করলে কবির খান খান্দেশি ১৬০১ সালে ঢাকার উত্তরখানে এসে বসবাস শুরু করেন। উত্তরখান নামক স্থানের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে কবির খানের নামের সঙ্গে মিল রেখে বলে জানা যায়। কবির খান খান্দেশির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছাপা হলো দলিলপত্র হিসেবে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

সরকারের অপচয় : রাজনৈতিক অর্থনীতি

আকবর আলি খান

ভূমিকা

প্রখ্যাত মার্কিন রসিক উইল রজার্সকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কীভাবে এত মজার মজার ঘটনা খুঁজে বের করেন। উইল রজার্স জবাব দেন, 'কাজটি খুবই সোজা; আমার কিছুই করতে হয় না। যা করার, সরকার তার লোকলস্কর নিয়ে নিজেই করে। আমি শুধু সরকারের কাজ পর্যবেক্ষণ করি। তারপর বিন্দুমাত্র রং না চড়িয়ে যা ঘটে, তা-ই বলি। তাতেই সবাই হাসতে থাকে।' উইল রজার্সের বক্তব্য অনুসারে যত দিন পৃথিবীতে সরকার নামক প্রতিষ্ঠানটি থাকবে, তত দিন হাসির ঘটনার অভাব হবে না। রসিকপ্রবরের এ বক্তব্য একই সঙ্গে ঠিক ও বেঠিক। ঠিক এ জন্য যে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর সব সরকারের দ্বারাই অসংখ্য তামাশা ঘটছে। বেঠিক এ জন্য যে সরকারের সব কৌতুকপ্রদ কাণ্ডকীর্তি হাসির ঘটনা নয়। যারা এসব কৌতুকের শিকার, তাদের জন্য এসব তামাশা অনেক ক্ষেত্রেই মর্মান্তিক বিয়োগান্ত নাটক। সম্পদের অভাবে সরকার অনেক দুঃখী মানুষের সর্বনিম্ন পর্যায়ের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে না। অথচ অপচয়ের জন্য সরকারের অর্থের অভাব হয় না। এ কথা ভাবতেও একই সঙ্গে হাসি পায় ও রাগ হয়।

সরকারি অর্থের অপচয় সব দেশেই কম-বেশি ঘটে। তবে যেসব দেশে সরকার ধনী, সেসব দেশে পেল্লায় অপচয়ের সম্ভাবনা বেশি। অপচয়ের কথা উঠলেই প্রথমে উইল রজার্সের জন্মভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম মনে পড়ে। শুরুতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু সরকারি অপচয়ের উদাহরণ তুলে ধরছি।

ক) নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে পশু চিকিৎসা বিভাগে গবাদিপশুর মূত্রত্যাগের অভ্যাস সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রকল্পে মার্কিন সরকার ৩ মিলিয়ন ডলার বা ২৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে। যেকোনো প্রাণীর জন্য মূত্রত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ

ধরনের প্রকল্পে সরকারের অনুদান মোটেও অস্বাভাবিক নয়। তবে এ প্রকল্পের অস্বাভাবিক বিষয় হলো, গবেষণার প্রতিপাদ্য ও তার ফলাফল। গবেষকেরা জানতে চান, গরু নদী পার হওয়ার সময়, না নদীতে নামার আগে প্রস্রাব করে, না নদী পার হওয়ার পর করে। ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গবেষণাটি শেষ হওয়ার পর জানা গেল, প্রকল্পে নিযুক্ত অধিকাংশ পর্যবেক্ষক গরুগুলো কখন নীরবে মূত্র ত্যাগ করে, তা ঠাহর করতে পারেননি (দুষ্ট লোকেরা বলে, গবেষকদের অনেকে বান্ধবীদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে গরু কী করছিল, সেদিকে তাঁরা খেয়াল রাখতে পারেননি। আবার অনেক গবেষক নদীর ধারেকাছেও যাননি।)। সুতরাং এ সম্পর্কে কিছু জানতে হলে আরেকটি প্রকল্পের প্রয়োজন হবে। বলা বাহুল্য, প্রকল্পটি ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি অপচয়ের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হিসেবে সিনেটর প্রক্সমায়ার স্মারক পুরস্কারে ভূষিত হয়।

খ) ২০০৫ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক উপকূলে আঘাত হানে। এ সময় মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ২৫ লাখ দুর্গত ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ৯ লাখ উপকারভোগী ছিল ভুয়া। হিসাব করে দেখা গেছে, এ ধরনের ভুয়া সাহায্য প্রাপকেরা ২ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ত্রাণের অর্থ দিয়ে অনেকে বিদেশে প্রমোদভ্রমণে গেছে। এমনকি ত্রাণের পয়সায় একজন অস্ত্রোপচার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করেছে।

গ) সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর ইরাককে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ১৩ বিলিয়ন ডলার অপচয় করা হয়েছে। অতিরিক্ত ৭.৮ বিলিয়ন ডলার লাপাত্তা হয়ে গেছে। এভাবে শ্যামচাচা বা আঙ্কেল স্যামের মোট গচ্চা গেছে ২০.৮ বিলিয়ন ডলার বা ১৮ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা, যা বাংলাদেশের বার্ষিক স্থূল উৎপাদনের দ্বিগুণের বেশি।

ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট দক্ষিণ চীনে পতিতাদের কীভাবে দায়িত্বের সঙ্গে স্বল্প মাত্রায় মদ্য পান করতে হয়, সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ২৬ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৮৩ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, চীনে এ গবেষণায় লব্ধ জ্ঞান পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে।

ঙ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে যেসব সরকারি কেনাকাটা করা হয়, তার প্রায় অর্ধেকই ভুয়া ও প্রতারণামূলক। সরকারি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে জুয়া খেলার দেনা শোধ করা হয়েছে। মদ কেনা হয়েছে, (বান্ধবীদের) সোনার অলংকারের দাম শোধ করা হয়েছে। এমনকি সরকারি অর্থে নৈশভোজ আয়োজিত হয়েছে। ডাক বিভাগের এক নৈশভোজে মাথাপিছু খরচ হয়েছে ১৬৭ ডলার বা প্রায় ১৪ হাজার টাকা।

চ) যারা কৃষিপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারের নির্দেশে কৃষিজমি পতিত রাখে, তাদের ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের ভর্তুকি দেওয়া হয়। উপশহর এলাকায় যারা লনে ঘাস লাগায়নি, তারাও এ সুবিধা দাবি করে ভর্তুকি পেয়েছে।

এ ধরনের অপচয়ের অজস্র উদাহরণ রয়েছে। এখানে একটি বিক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ চিত্র মোটেও পূর্ণাঙ্গ নয়। তবু ওপরের উদাহরণগুলো থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে মার্কিন সরকারের কর্মকাণ্ডে বিপুল অপচয় রয়েছে। সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর দাবি করতেন, মার্কিন সরকারের ব্যয়ের ৪৮ শতাংশই অপচয় হয়ে থাকে।[১]

বাংলাদেশে অপচয়ের পরিমাণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হিসাব না থাকলেও এর ব্যাপকতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনপ্রিয় প্রবাদ হলো, 'সরকার কি মাল দরিয়া মে ঢাল'। অনুমান করি, সরকারের মাল এত তছরুপ হয় যে স্থলে তা লুকিয়ে রাখার জায়গা পাওয়া যায় না, তাই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসকেরা দক্ষিণ এশিয়াতে গণপূর্ত বিভাগ বা PWD (Public Works Department) থেকে অপচয় ও দুর্নীতি দূর করতে পারেনি। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা ঠাট্টা করে বলতেন, PWD-এর পূর্ণ নাম হলো Plunder Without Danger বা নির্ভয়ে লুট করো[২] (মুন, পেন্ডেরেল, ১৯৮৯, ৮১৯)। স্মরণ করা যেতে পারে যে বর্তমানে প্রকৌশল-সংক্রান্ত যত মন্ত্রণালয় রয়েছে (যথা সড়ক ও জনপথ, গণপূর্ত, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রেলপথ, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন) সবই ছিল সে সময় গণপূর্ত বিভাগের আওতায়।

অপচয়ের ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে একটি বড় তফাত রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অপচয় অভিন্ন। উন্নত দেশগুলোতে দুর্নীতি ছাড়া অন্যান্য কারণেও অপচয় ঘটে। নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবাদিপশুর মূত্রাভ্যাস নিয়ে গবেষণায় দুর্নীতি ঘটেনি, তবে অপচয় ঘটেছে। অথচ বাংলাদেশে যেখানেই অপচয়ের অভিযোগ ওঠে, সেখানেই দুর্নীতি ঘটে। দৈনিক *কালের কণ্ঠ* পত্রিকার ২০১১ সালের ৬ অক্টোবর তারিখের নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি বিবেচনা করুন : 'বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সরকার গত বছর বেশ ঘটা করে দেশের ৩৮টি জেলায় যে ১ কোটি ৫ লাখ এনার্জি সেভিং বাল্ব বিনা মূল্যে বিতরণ করেছিল, এর ৮০ শতাংশই নষ্ট হয়ে গেছে বাতি জ্বালানোর এক সপ্তাহের মধ্যে। জলে গেছে ১০৩ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই। ভেস্তে গেছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সাধের প্রকল্পটির প্রথম পর্ব। অথচ প্রতিটি বাতির আয়ুষ্কাল ছিল ১০০০০ ঘণ্টা, যা একনাগাড়ে চললেও ৪১৬ দিন পর্যন্ত টিকে থাকার কথা। অভিযোগ উঠেছে, দুর্নীতির মাধ্যমে নিম্ন মানের বাল্ব কেনার কারণেই এ কাণ্ড ঘটেছে। রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি জেলায় *কালের কণ্ঠ*-এর সরেজমিন অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে এমন কথা।' এখানে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। প্রকল্পটির দোষে নয়, বরং দুর্নীতির জন্য সরকারের অর্থের নয়ছয় ঘটল। আরেকটি

ঘটনা বিবেচনা করুন। সপ্তম সংসদের স্বাস্থ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি জানায় যে বেশ কয়েকজন সিভিল সার্জন হাসপাতালের জন্য বৈদ্যুতিক বাল্ব ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বাজারের খুচরা দামের চেয়ে সাড়ে ৬ গুণ থেকে ২৫ গুণ বেশি দামে কিনেছে।[৩] এ ধরনের ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। বিশ্বব্যাংকের (২০০০) প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৭-৯৮ সময়কালে সরকারি হিসাব কমিটি (Public Accounts Committee) ৪৯৭টি নিরীক্ষা-আপত্তি নিষ্পত্তি করে। এসব আপত্তির আর্থিক সংশ্লেষ ছিল ১ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা। ওই সময়ে বিবেচনাধীন আপত্তির সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার ৪১২। ৪১৭টি নিরীক্ষা আপত্তিতে যদি ১ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা জড়িত থাকে, তবে ৫৬ হাজারের বেশি আপত্তির আর্থিক সংশ্লেষ যে বিপুল হবে, তা অতি সহজেই অনুমেয়। এ হিসাব করা হয়েছিল ২০০০ সালে। এখন তা অনেক বেড়ে গেছে। তবে নিরীক্ষায় সরকারি অপচয়ের অতি ক্ষুদ্র অংশ ধরা পড়ে। যথাযথ অনুমোদন নিয়ে অপচয় হলে তাকে সরকারি নিরীক্ষায় অপচয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। নিরীক্ষাতে শুধু সরকারি খরচের অনিয়ম সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু সরকারের সম্পদের সব অপচয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় না। কাজেই অপ্রতুল উপাত্ত সত্ত্বেও এ কথা অনুমান করা মোটেও শক্ত নয় যে বাংলাদেশে সরকারি অপচয় অবিশ্বাস্যভাবে বিপুল।

সরকারে অপচয়ের ব্যাপকতার তুলনায় সমস্যাটি নিয়ে অত্যন্ত অপ্রতুল গবেষণা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সরকারের অপচয়ের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য দুটি। প্রথমত, সরকারি অপচয়ের মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা; দ্বিতীয়ত, সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা। প্রবন্ধটি চার ভাগে বিভক্ত। ভূমিকার পর দ্বিতীয় ভাগে সরকারের অপচয়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে বিভিন্ন প্রকারের অপচয় চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বশেষ ভাগে এই নিবন্ধের মূল বক্তব্যের ভিত্তিতে সরকারি অপচয়ের সমাধান সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে।

সরকারি অপচয়ের সংজ্ঞা

অপচয়ের উদাহরণ দেওয়া যত সহজ, তার সংজ্ঞা নির্ধারণ তত সহজ নয়। ইংরেজি ভাষায় অপচয়ের সমার্থবোধক শব্দ হলো waste। শব্দটির উৎপত্তি হলো লাতিন শব্দ wastus থেকে, যার শাব্দিক অর্থ হলো জমি পতিত ফেলে রাখা বা কর্ষণ না করা। বাংলা অপচয় শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এর খুবই কাছাকাছি। সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, অপচয় শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো মূল্যবান দ্রব্য রক্ষা না করা।[৪] স্পষ্টতই, মূল্যবান সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে ব্যর্থতা (জমি পতিত ফেলে রাখার মতো) অপচয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে ব্যর্থতাই হচ্ছে অপচয়।

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সরকারি অপচয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। নিম্নলিখিত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয়ের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যেতে পারে :

- আইনগত
- অর্থনৈতিক
- নৈতিক

আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয়

আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয়ের দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, সরকারি ব্যয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কি না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি অর্থ ব্যয় করতে হলে সংসদের অনুমোদন লাগে। এই অনুমোদন ছাড়া যেকোনো সরকারি ব্যয় অপচয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর ২(৪) ধারায় অপচয়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে: 'অপচয় অর্থ বার্ষিক বাজেটে যে উদ্দেশ্যে (purpose) অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় বা ব্যবহার না করিয়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় বা ব্যবহার করা'। দ্বিতীয়ত, সরকারের ব্যয় ও ক্রয়সংক্রান্ত যেসব বিধিবিধান রয়েছে, তা অগ্রাহ্য করে যেকোনো ব্যয় করলে তা অপচয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয়ের সংজ্ঞা স্পষ্ট, কিন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ। এই সংজ্ঞার দুটি পূর্ব-অনুমান রয়েছে। প্রথমত, অনুমান করা হচ্ছে যে সরকার খারাপ কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিলেও তা ব্যয় করলে অপচয় হবে না। বরং সরকার যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দিয়েছে, সে উদ্দেশ্যে ব্যয় না করলে অপচয় হবে। ধরুন, সরকার জেলখানার কয়েদিদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য বরাদ্দ দিল। সে অর্থ দিয়ে জেলে হাসপাতাল নির্মাণ করলে তা সরকারি অর্থের অপচয় হবে। কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশে নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসি দিলে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয় হবে না। দ্বিতীয়ত, নির্ধারিত উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় বা ব্যবহার করাই যথেষ্ট। এতে কোনো ফল না পাওয়া গেলে বা উল্টো ফল পাওয়া গেলেও ব্যয়টি অপচয় হিসেবে বিবেচিত হবে না।

নৈতিক দিক থেকে এই দুটি অনুমানের একটিও গ্রহণযোগ্য নয়। বাজেটে বরাদ্দ অনুমোদন করেন সংসদ সদস্যরা বা রাজনীতিবিদেরা। এঁরা সব সময় জনস্বার্থে কাজ করেন না; অনেক সময় নিজেদের স্বার্থে কাজ করেন। মার্কিন সাংসদদের সম্পর্কে একটি সুন্দর চুটকি প্রায়ই শোনা যায়। ঘটনাটি হলো, একজন কংগ্রেসম্যান গভীর রাতে সংসদ ভবনের সামনে বিরাট মাঠ পেরিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় তিনি এক ছিনতাইকারীর খপ্পরে পড়েন। ছিনতাইকারী কংগ্রেসম্যানকে বলল, 'দে ব্যাটা, তোর কাছে যা টাকা আছে, তা আমাকে দিয়ে দে।' কংগ্রেসম্যান বললেন, 'জানো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ? আমি একজন কংগ্রেসম্যান।' ছিনতাইকারী বলল, 'পিস্তলটা দেখেছিস? উল্টাপাল্টা কিছু করলে শেষ করে দেব। দে, দে, টাকা দে। তোর পকেটের টাকার মালিক তুই নস। আমার মতো করদাতার টাকা তুই মেরেছিস।

দে, আমার টাকাই আমাকে ফেরত দে।'

ছিনতাইকারী এই ক্ষেত্রে কিছুটা অতিরঞ্জন করেছে, কিন্তু একেবারে মিথ্যা বলেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাজেট চূড়ান্ত করেন সাংসদেরা। এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনেক সংসদ সদস্যই নিজের স্বার্থ হাসিল করেন। এই প্রক্রিয়ার নগ্ন প্রকাশ দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংসদদের নির্বাচনী এলাকায় ব্যয়ের জন্য বিপুল বরাদ্দে। এসব বরাদ্দে একমাত্র বিবেচনা রাজনীতি। এ ধরনের বরাদ্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে pork বা শূকর মাংস নামে পরিচিত। এই নাম এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল থেকে। গৃহযুদ্ধের আগে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা শূকরের মাংসের যেসব অংশ তারা পছন্দ করত না, সেগুলো কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের দিয়ে দিত। দাসরা সে মাংস শুঁটকি করে মটকায় জমিয়ে রাখত। যখন খাওয়া কম পড়ত, তখন এগুলো কাজে লাগত। এখনকার নির্বাচনী প্রতিনিধিরাও তাঁদের এলাকার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ জাতীয় বাজেট থেকে আলাদা করে রাখেন। তাই নিজের নির্বাচনী এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দ পর্ক বা শূকরের মাংস নামে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটে এ সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পর্কের' পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সারণি ১.১-এ দেখা যাবে।

সারণি ১.১
মার্কিন বাজেটে 'পর্কের' পরিমাণ

বছর	মোট পর্কের পরিমাণ (বিলিয়ন ডলারে)	মোট প্রকল্পের সংখ্যা
১৯৯১	৩.১	৫৪১
১৯৯৪	১০	১৪৩৯
২০০০	১৭.৭	৪৩২৬
২০০১	১৮.৩	৬৩৩৩
২০০২	২০১	৬৩৪১
২০০৩	২২.৫	৯৩৬২
২০০৪	২২.৯	১০৬৫৬
২০০৫	২৭.৩	১৩৯৭৭
২০০৬	২৯	—

উৎস : উইকিপিডিয়া

পর্ক পদ্ধতিতে বাজেটে যেসব প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থের অপচয় ঘটে। এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও ১৯৯১-২০০৬ সময়কালে পর্কের পরিমাণ ও প্রকল্পের সংখ্যা স্ফীত

হয়েছে। ২০০৬ সালে পর্কের বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের প্রায় ১.১ শতাংশ। অবশ্য সম্প্রতি এ ধরনের প্রকল্পের বরাদ্দে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজনীতিবিদেরা ধোয়া তুলসীপাতা নন। বাজেটে ব্যয়ের বরাদ্দ সংসদ অনুমোদন করলেই সব ব্যয় হালাল হয়ে গেল, এ যুক্তি মানা শক্ত। সংসদ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো বরাদ্দ করে, তবে তাকে অপচয় বলে গণ্য করা উচিত। কিন্তু আইন এ কথা মানে না। আইনগত সংজ্ঞায় সঠিক পদ্ধতি মেনে বরাদ্দ ব্যয় করলেই তা বৈধ বিবেচিত হবে।

অপচয়ের আইনগত সংজ্ঞার সুবিধা ও অসুবিধা—দুটিই রয়েছে। সুবিধা হলো, এ ব্যবস্থায় ব্যয়ের ওপর জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব। আর অসুবিধা হলো, এ ব্যবস্থা অতিকেন্দ্রীভূত এবং পরিস্থিতির নিরিখে পরিবর্তনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। প্রতিনিয়ত যথাযথ মূল্যায়ন না করলে এ ব্যবস্থায় অপচয় বাড়তেই থাকবে। এর ফলে গোটা বাজেট প্রক্রিয়া অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০-এর দশকে ঘটে। মার্কিন সেনাবাহিনীর ইউএস কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সকে (US Army Corps of Engineers) পানিসংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেখা যায়, সব সাংসদ তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় নতুন নতুন অবকাঠামো দাবি করতে থাকেন। এত অবকাঠামোর অর্থায়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ফেডারেল নৌপরিবহন আইন, ১৯৩৬ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৩৯ নির্দেশ দেয় যে ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণের (Cost-Benefit Analysis) নিরিখে কোনো প্রকল্প গ্রহণযোগ্য না হলে তার অর্থায়ন করা যাবে না।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয়

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে ব্যয়ের পরিমাণ উপকারের আর্থিক পরিমাপের চেয়ে বেশি, সেখানে অর্থের অপচয় ঘটে। কিন্তু ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণের (Cost-Benefit Analysis) কয়েকটি বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, উপকারের বর্তমান আর্থিক পরিমাপ নির্ভর করে বিকল্প বিনিয়োগের অনুমিত সুদের হার বা discount rate-এর ওপর। যদি সুদের হার কম হয়, তবে প্রকল্প সমাপ্তির অনেক পর যেসব উপকার পাওয়া যায়, তার আর্থিক পরিমাপের বর্তমান মূল্য বেশি হবে। যদি সুদের হার বেশি হয়, তবে বর্তমান মূল্যে ভবিষ্যতে প্রাপ্য উপকারের আর্থিক পরিমাপ অনেক কমে যাবে। ধরুন, একটি সেচ প্রকল্পের ফলে ৫০ বছর পর ১০ লাখ টাকার বাড়তি ফসল পাওয়া যাবে। যদি সুদের হার ৬ শতাংশ থাকে, তবে ৫০ বছর পর প্রাপ্ত ১০ লাখ টাকা আজকের ৫৪ হাজার ২৮৮ টাকার সমান। যদি সুদের হার ১২ শতাংশ হয়, তবে ৫০ বছর পরের ১০ লাখ টাকার উপকার বর্তমান মূল্যে ৩ হাজার ৪৬০ টাকার সমান। এই ক্ষেত্রে সুদের হার অর্ধেক হলে ৫০ বছর পরের উপকার ১৫.৬ গুণ বেড়ে

যায়। অনেক দেশেই সুদের হার কম ধরে ভবিষ্যৎ উপকারের পরিমাণ ফাঁপানো হয়।

দ্বিতীয়ত, কোনো প্রকল্পের ফলে ভবিষ্যতে কী উপকার হবে, সে সম্পর্কে অনেক উপাত্ত পাওয়া যায় না। এসব হিসাব অনুমানের ওপর করা হয়। যাঁরা প্রকল্পের সমর্থক, তাঁরা সুবিধাজনক অনুমান ব্যবহার করে উপকারের পরিমাণ অতিরঞ্জিত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পানিসংক্রান্ত অবকাঠামোর ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণ নিয়ে সিনেটর প্রক্সমায়ার যথার্থই বলেছেন, 'কংগ্রেসের চাপে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার বাহিনী উপকার আবিষ্কারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। একটি প্রকল্পে কত উর্বরতা অবিলম্বে বাড়বে, তা অতি আশাবাদী অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করা যেতে পারে। ১০, ১২ বা ২০ বছর পর ফসলের মূল্য নিয়ে একই ধরনের অনুমান করা যেতে পারে। এমনকি বিনোদন খাতে উপকারও যোগ করা যেতে পারে।'[৫] এসব অতিরঞ্জিত হিসাব যে সঠিক নয়, তা এ মুহূর্তে প্রমাণ সম্ভব না-ও হতে পারে।

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয় কমিয়ে দেখানো হয়। পরিবেশদূষণসহ বহিঃপ্রভাবের (externalities) কুফল ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছে করেই প্রকল্পের ব্যয় কম করে দেখানো হয়। একবার প্রকল্প শুরু হলে তা আর অসম্পূর্ণ রাখা যায় না। বাড়তি ব্যয় করে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হয়। এ ঘটনা শুধু বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশেই ঘটে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এসব প্রবণতা রোধ করা যাচ্ছে না। সিনেটর প্রক্সমায়ার (১৯৮০) দেখিয়েছেন যে সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোর অব ইঞ্জিনিয়ারের ১৭৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৮৩টি প্রকল্পে (মোট প্রকল্পের ৪৭ শতাংশ) প্রকৃত ব্যয় অনুমোদনের সময় অনুমিত ব্যয়ের দ্বিগুণের বেশি হয়েছে।

ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণ, আপাতদৃষ্টে আকর্ষণীয় মনে হলেও এবং বাস্তবে এ ধরনের বিশ্লেষণের নিরিখে যাচাই-বাছাই অপচয় হ্রাসে সহায়ক হলেও অপচয় বন্ধের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণের নামে অনেক সময় অগ্রহণযোগ্য প্রকল্প চালু হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা একটি বহুল প্রচলিত চুটকি মনে করিয়ে দেয়। সেটি এ রকম। একবার হিসাবরক্ষকের একটি চাকরির জন্য একজন গণিতজ্ঞ, একজন হিসাবরক্ষক ও একজন অর্থনীতিবিদ সাক্ষাৎকারে হাজির হন। প্রথমে ডাক পড়ল গণিতজ্ঞের। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে কত হয়? তিনি জবাব দিলেন, 'চার।' তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হয়, এর কোনো ব্যতিক্রম আছে কি না। তাঁর সাফ জবাব হলো, 'না।' এবার হিসাবরক্ষককে ডেকে একই প্রশ্ন করা হয়। তিনি জবাব দিলেন, সাধারণত দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে চার হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫ অথবা ১০ শতাংশ এদিক-সেদিক হতে পারে। সবশেষে এলেন অর্থনীতিবিদ। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো, দুইয়ের সঙ্গে দুইয়ের যোগফল কত? তিনি নিজের চেয়ার থেকে উঠে প্রশ্নকর্তার কাছে চলে যান এবং তাঁর কানে ফিসফিস করে প্রশ্ন করেন, 'স্যার, আপনি কত চান?' বেশির ভাগ ব্যয়-উপকার

বিশ্লেষণে যে ফলাফল প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের খুশি করে, তা-ই অনেক অর্থনীতিবিদ পরিবেশন করে থাকেন।

ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণ নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণের মান উন্নত করার জন্য প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৫ থেকে ১০ বছর পর সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, কোথায় কোথায় ভুল করা হয়েছে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের বিশ্লেষণের মান বাড়াতে হবে। লাভজনক প্রকল্প নির্বাচনের আরেকটি সহজ উপায় হলো, সম্ভাব্য উপকারভোগীদের মতামত সংগ্রহ করা। যদি উপকারভোগীরা ব্যয়ের অংশ বহনে রাজি হন, তবে বুঝতে হবে যে প্রকল্পটির চাহিদা রয়েছে। জোগানতাড়িত প্রকল্পের পরিবর্তে চাহিদাতাড়িত প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া সমীচীন হবে।

অর্থনীতির একটি বড় দুর্বলতা হলো, অনেক বড় সমস্যা নিয়ে অর্থনীতিবিদেরা একমত নন। এখানে কে শুদ্ধ আর কে ভ্রান্ত, তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। অর্থনীতি হলো একমাত্র শাস্ত্র, যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্যের জন্য উভয় ঘরানার অর্থনীতিবিদদেরই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এমনকি একই বছরে বিপরীতধর্মী বক্তব্যের জন্য দুজনকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ১৯৭৪ সালে একই সঙ্গে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান গুনার মিরদাল ও ফ্রিডরিক অগুস্ত ফন হায়েক। হায়েক ছিলেন মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা। মিরদাল নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশ-অর্থনীতির সমর্থক। এঁদের একজনের পরামর্শ সঠিক হলে অন্যজনের বক্তব্য ভুল। তবু তাঁরা দুজন একই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

অপচয়ের অর্থনৈতিক তাৎপর্য নিয়েও অর্থনীতিবিদেরা বিভক্ত। যদিও দুষ্প্রাপ্য সম্পদের অপব্যবহারের কুফল নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই, তবু কেইনস ও তাঁর অনুসারীরা মনে করেন যে অর্থনৈতিক মন্দার সময় সরকারের বাড়তি ব্যয় আপাতদৃষ্টে অপচয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ। কেইনসের অনুগামীরা বলে থাকেন, যদি দেশে বেকার সমস্যা প্রকট হয় এবং কর্মসংস্থানের জন্য ভালো কোনো প্রকল্প না থাকে, তবে সরকার বেকারদের গর্ত খুঁড়তে লাগিয়ে দিতে পারে। বেকারদের আয় বাড়লে তাদের চাহিদা বাড়বে। এর ফলে উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে। গুণক প্রভাবে (Multiplier effects) মন্দার কালো মেঘ কেটে যাবে। যদি গর্ত খুঁড়লেও যথেষ্ট কর্মসংস্থান না হয়, তবে গর্তগুলো ভর্তি করুন এবং আবার নতুন করে গর্ত খুঁড়তে ও ভর্তি করতে থাকুন। একসময় গুণকের জাদুস্পর্শে মন্দা অতীত ইতিহাস হয়ে যাবে। বিনা প্রয়োজনে গর্ত খোঁড়া আর ভর্তি করা অপচয় মনে হতে পারে। কিন্তু কেইনসের মতে, বেকারদের জন্য কাজ সৃষ্টি করে সরকারের তথাকথিত অপচয় অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে।

কেইনসের অনুগামী নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানকে সম্প্রতি প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিশ্বব্যাপী বিরাজমান বর্তমান মহামন্দার (২০০৮-২০১২) সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে। ক্রুগম্যানের জবাব ছিল, সরকারের খরচ অনেক বাড়াতে হবে। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হলো, এ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধির পক্ষে জনসমর্থন না থাকলে কী করা যাবে? ক্রুগম্যান পরামর্শ দিলেন, সারা পৃথিবীতে গুজব রটিয়ে দিন যে মহাশূন্য থেকে আজব জীবেরা পৃথিবী আক্রমণ করতে আসছে এবং এ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কোটি কোটি প্রহরীর প্রয়োজন। এই অজুহাতে একবার চাকরি সৃষ্টি করলে মন্দা কেটে যাবে। যখন ভোটাররা বুঝতে পারবে যে এ গুজব ভিত্তিহীন, তত দিনে মন্দা থাকবে না। এ ধরনের বক্তব্য হাসি-তামাশা নয়। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এসব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন অতিশ্রদ্ধেয় অর্থনীতিবিদেরা। কেইনস নিজেই লিখেছেন, 'পিরামিড নির্মাণ, ভূমিকম্প এমনকি যুদ্ধ সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে।'[৬] কেইনস থেকে ক্রুগম্যান খুব দূরে যাননি। কেইনস বলেছিলেন, যুদ্ধ অর্থনীতিকে চাঙা করে। ক্রুগম্যান বলছেন, ভুয়া যুদ্ধের প্রস্তুতিও মন্দা দূর করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে কেইনসের অনেক সমর্থক রয়েছেন। তাঁরা সরকারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাকরি সৃষ্টির পক্ষে কেইনসের অর্থনৈতিক যুক্তির সঙ্গে নৈতিক যুক্তি যোগ করে থাকেন। তাঁরা বলছেন যে সরকারে অপ্রয়োজনীয় চাকরিও গুণক প্রভাবের (multiplier effects) ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক হবে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, দেশের মানুষকে বেকারত্বের দুর্বিষহ অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়া সরকারের পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব। কর্মবিহীন পদে বেকারদের চাকরি দিলে একই সঙ্গে অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা এবং বেকার মানুষের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব। কাজেই সরকারে উদ্বৃত্ত জনবল নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

কেইনসের তত্ত্ব ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেনি। এই বক্তব্য গতানুগতিক ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে শুধু কর্মসংস্থানের উপকার পরিমাপের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে বাজারদামে উপকারের আর্থিক মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অথবা ছায়ামূল্য (shadow price) ব্যবহার করতে হবে। ছায়ামূল্য চোখে দেখা যায় না, অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করতে হয়। এ ধরনের হিসাব অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিমুক্ত হয় না। উপরন্তু সঠিক ব্যয়-উপকার বিশ্লেষণের জন্য যেসব উপাত্তের প্রয়োজন, তা-ও পাওয়া যায় না। আশা করা হয় যে ভুল হিসাব সংশোধন করতে করতে একপর্যায়ে নির্ভরযোগ্য হিসাব করা সম্ভব হবে।

তবে অপচয়ের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আইনভিত্তিক অপচয়ের সংজ্ঞাকে অনেক সম্প্রসারণ করেছে। প্রথমত, অপচয়ের আইনি সংজ্ঞা শুধু সরকারি ব্যয়ে সীমাবদ্ধ। অর্থনৈতিক অপচয়ের সংজ্ঞায় আর্থিক বরাদ্দ ছাড়া অন্যান্য সম্পদও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন ধরুন, রেলওয়ের অপচয় নির্ণয় করতে হলে শুধু ব্যয় পর্যালোচনা করলে

চলবে না; ইতিপূর্বে ভূমি, রেললাইন, যন্ত্রপাতিসহ সব ধরনের বিনিয়োগের কতটুকু যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে, তা বিবেচনায় নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ব্যয়ের পরিমাণ শুধু বরাদ্দের ভিত্তিতে নির্ণয় করা যাবে না। বহিঃপ্রভাবের মোট ক্ষতিও বিবেচনায় নিতে হবে। তৃতীয়ত, যতক্ষণ একই সম্পদ ব্যবহার করে বাড়তি উপকার সৃষ্টি করা সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয় থেকে যাবে। স্ট্যানবেরি ও টমসন তাই বলছেন, 'আমরা গড়ে যা পাই আর যা পাওয়া সম্ভব—এই দুইয়ের ব্যবধানই হচ্ছে অপচয়।'[৭] আইনি সংজ্ঞায় আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। তাই আইনি সংজ্ঞায় সরকার যে ব্যয় বরাদ্দ করেন, তা সঠিকভাবে খরচ করলে কোনো অপচয় হয় না।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয়

অপচয়ের অর্থনৈতিক সংজ্ঞা অপ্রয়োজনীয় কাজে সম্পদ বরাদ্দ চিহ্নিত করে। অপচয়ের আইনি সংজ্ঞায় অননুমোদিত ব্যয় বন্ধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু ব্যয় বরাদ্দ আইনগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হলেও বাস্তবায়নের ব্যর্থতার ফলে অপচয় ঘটতে পারে। ম্যাককিনসি তাই অপচয়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, 'অযোগ্য অথবা অকার্যকর রীতিনীতি, ব্যবস্থা অথবা নিয়ন্ত্রণের ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়।' সাধারণত অনুমান করা হয়, ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ঘটে। ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার মূল কারণ পদ্ধতির ত্রুটি নয়। এর মূল কারণ হলো, ব্যবস্থাপকদের নিষ্ঠার ও যত্নের অভাব। ব্যবস্থাপকেরা নিজের সম্পদের যত যত্ন নেন, সরকারের সম্পত্তির তত খোঁজখবর নেন না। ব্যবস্থাপনার চেয়েও বড় সমস্যা এখানে নৈতিক। বাংলাদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক বিধির (General Financial Rules) ১০(১) বিধিতে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সব গণকর্মকর্তা এমন সতর্কতা অবলম্বন করবেন, যা প্রতিটি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের অর্থের বিষয়ে করে থাকেন।'[৮] এই নৈতিক দায়িত্ব সব সরকারি কর্মকর্তা পালন করলে অপচয় অনেক কমে যেত। দুর্ভাগ্যবশত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ দায়িত্ব প্রতিপালিত হয় না।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, অপচয় একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এর তিনটি প্রধান মাত্রার কোনোটিই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যদি আইনি অপচয় ঘটতে থাকে, তবে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। যদি অর্থনৈতিক অপচয় রোধ না করা যায়, তবে সীমিত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে না। যদি সম্পদ ব্যবহারকারী সরকারি কর্মকর্তাদের নৈতিক আচরণে ঘাটতি থাকে, তবে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, যার ফলে সম্পদের অপব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিরোধ করা যাবে না। অপচয়ের তাই কোনো সহজ সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভব নয়। যখনই অপচয়

দেখা যায় তা রোধ করতে হবে। স্ট্যানবেরি ও টমসন তাই যথার্থই বলেছেন, অপচয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণই হচ্ছে অপচয় হ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ।[৯]

অপচয়ের প্রকারভেদ ও এর তাৎপর্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টুয়ার্ট পটার ১৯৬৪ সালে একটি মামলায় অশ্লীলতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা অপচয়ের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। জাস্টিস পটার বলেছেন যে অশ্লীলতার সংজ্ঞা কী, তা তিনি জানেন না। তবে অশ্লীলতা যখন তাঁর চোখের সামনে পড়ে, তখন তিনি তা ঠিকই চিনতে পারেন। অপচয়ের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রণয়ন দুরূহ হলেও অপচয় ঘটলে তা সহজেই চিহ্নিত করা যায়। তাই অপচয়ের সম্যক উপলব্ধির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অপচয়ের বিভিন্ন প্রকার বা রূপ চিহ্নিত করা। স্ট্যানবেরি ও টমসন নিম্নলিখিত নয়টি প্রকৃতির অপচয় চিহ্নিত করেছেন :

১) কারিগরি দিক থেকে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে ব্যর্থতা (Technical inefficiency or X-inefficiency) : কারিগরি অদক্ষতা তখনই দেখা দেয়, যখন সর্বনিম্ন খরচে সর্বোচ্চ উৎপাদন অর্জন সম্ভব হয় না। মূলত ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা থেকে এ অপচয়ের উদ্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেসরকারি খাত কম ব্যয়ে যে কাজ করতে পারে, সরকারি খাতে তা করতে অনেক বেশি খরচ হয়। যেমন ধরুন, ফোর্ড মোটর কোম্পানিতে কেনাকাটার জন্য যে পরিমাণ জনবল লাগে, একই কাজ করতে মার্কিন নৌবাহিনীতে তার চার গুণ লোক লাগে। তার কারণ, ফোর্ড মোটর কোম্পানিতে ক্রয়ের জন্য তিন থেকে সর্বাধিক নয়টি স্তরের অনুমোদনের দরকার। মার্কিন নৌবাহিনীতে একই কাজে গড়ে ৩৫ জন কর্মকর্তার অনুমতি লাগে। এর একটি বড় কারণ হলো, সরকার ও বেসরকারি খাতের লক্ষ্য ও পদ্ধতির মধ্যে বড় ধরনের ফারাক রয়েছে।

২) সঠিক মূল্য নির্ধারণে ব্যর্থতার ফলে সম্পদের অপচয় (Allocative inefficiency or doing too much or too little) : প্রকৃত উৎপাদন-ব্যয়ের কম মূল্যে কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয় করলে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহৃত হবে এবং তাতে সম্পদের অপচয় ঘটে। আবার মূল্য বেশি নির্ধারণ করলে প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হবে। এর ফলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না।

৩) ভ্রান্ত বিনিয়োগ (Allocative inefficiency or doing the wrong things) : সরকারে প্রধানত তিন ধরনের ভ্রান্ত ব্যয় দেখা যায়। প্রথমত, অনেক ব্যয় করা হয় যার ফলে প্রকৃতপক্ষে কারও কোনো লাভ হয় না। ধরুন, সরকার একটি পাঠাগার চালাচ্ছে, যেখানে দিনে গড়ে একজন লোকও যায় না। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সম্পদের অপচয়। দ্বিতীয়ত, অসম্ভব কিছু করার জন্য অর্থ ব্যয় করা নিছক অপচয়। তৃতীয়ত, সাংসদদের চাপে অনেক সময় নেব্রাস্কা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবাদিপশুর মূত্রত্যাগের অভ্যাসের মতো (উল্লিখিত) প্রকল্প নেওয়া হয়।

৪) সরকারি কর্মকাণ্ডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (Spillover effects) : সরকারের প্রায় সব ধরনের কর্মকাণ্ডেরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন ধরুন, সরকার আয়কর আরোপ করলে এর প্রভাব শুধু কর প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। করদাতাদের হিসাব তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ১৯৯৩ সালের একটি হিসাব থেকে দেখা যায় যে আয়করসংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করদাতাদের আয়করের অতিরিক্ত ১৫ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করতে হয়েছে। এর একটি বড় অংশ অপ্রয়োজনীয়। এ ছাড়া কর আরোপের ফলে অনেক করদাতা নিরুৎসাহিত হয়ে উৎপাদন কমিয়ে দেন। আবার অনেকে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য সম্পদের অপচয় করেন। এ ধরনের সব অনভিপ্রেত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অপচয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আরেকটি হিসাব থেকে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার-সংক্রান্ত আইনকানুন মানতে ৪০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়। যেহেতু এসব ব্যয় সরকারের বাজেটে প্রতিফলিত হয় না, সেহেতু অনেকে ধরে নেন যে এ ধরনের কোনো খরচ নেই। এ ধারণা একেবারে ভুল। তাই এ ধরনের অপচয় বিবেচনায় নেওয়া বাঞ্ছনীয়। সরকারের বিধিবিধান এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে সরকারের নিয়ম প্রতিপালনের ব্যয় (Compliance Cost) সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে।

৫) অলস সম্পদ (idle asset) : সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ রয়েছে। অথচ এসব সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। কোথাও কোথাও অব্যবহৃত নগদ অর্থ রয়েছে। এসব অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা হলে সরকারের ঋণের পরিমাণ কমে যেত এবং এতে সরকারের সুদ বাবদ ব্যয় কমে যেত। এই অলস অর্থের জন্য সরকারের সুদ বাবদ অপচয় হচ্ছে। আবার কোনো কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত জমি রয়েছে। এসব জমি ব্যবহারে ব্যর্থতা সম্পদের অপচয়। কোনো কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের অনেক বেশি যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার্য পণ্য রয়েছে। এতেও সম্পদের অপচয় ঘটে। সরকারের অব্যবহৃত ও অলস সম্পদের ফলে বিপুল পরিমাণ অপচয় হচ্ছে।

৬) দুর্নীতি, প্রতারণা, চুরি ও লাল ফিতা (Corruption, Fraud, Theft and Red tape) : দুর্নীতি, প্রতারণা ও সরকারি সম্পদের চুরির সঙ্গে অপচয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অপরাধীদের যা লাভ হয়, তার চেয়ে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। যদি ঘুষ দিয়ে লাভ না হয়, তবে কেউ ঘুষ দেবে না; তারা রাষ্ট্রের পাওনা রাষ্ট্রকেই শোধ করবে। তাই ঘুষখোরকে ঘুষদাতার জন্য লাভের

সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি, প্রতারণা ও চুরি রোধ করতে রাষ্ট্রকে সরকারি ব্যয়ের নজরদারির জন্য প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয়। এতে দুই ধরনের অপচয় ঘটে। প্রথমত, নজরদারির জন্য অতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যয় বাড়ে; দ্বিতীয়ত, সরকারি নজরদারিকে কেন্দ্র করে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য দেখা দেয়। লাল ফিতার উৎপত্তি হয় সরকারের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের জন্য সৃষ্ট বিধি ও পদ্ধতি থেকে। একবার কোনো বিধি ও পদ্ধতি সৃষ্টি হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও তার কোনো পরিবর্তন হয় না। কাজেই কোনো বিধি ও পদ্ধতির প্রয়োজন না থাকলেও তা বহাল থাকে। এসব অপ্রয়োজনীয় বাধানিষেধ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিলম্বিত করে। যুক্তরাষ্ট্রে হিসাব করে দেখা গেছে যে সরকারের বিধিবিধান প্রয়োগের নজরদারিতে সরকার এক টাকা ব্যয় করলে কাগজপত্র তৈরি করার জন্য বেসরকারি খাতের ব্যয় হয় ১০ টাকা। কাজেই এ খাতে বেসরকারি খাতের অপচয় বিপুল।

৭) ত্রুটিপূর্ণ সরকারি উদ্যোগ (Leaky Bucket) : অনেক ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ দিল্লির লাড্ডুর মতো। দিল্লির লাড্ডু সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, এটি না খেলে দুঃখ থাকবে আবার খেলেও দুঃখ হবে। সরকারকে অনেক ব্যবস্থা নিতে হয়, যা স্পষ্টতই ত্রুটিপূর্ণ, অথচ এসব ব্যবস্থা না নেওয়াও সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি উদাহরণ হলো বেকার ভাতা। যখন বেকারের সংখ্যা বাড়ে, তখন তাদের ভাতা না দিলে তাদের জন্য বেঁচে থাকাই একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আবার বেকার ভাতা পেলে অনেক বেকার কাজ না করে বেকার থাকাই পছন্দ করে। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য বেকার ভাতা অর্থের অপচয়। অন্যদিকে এ ভাতা তুলে দিলে অনেক যোগ্য সাহায্যপ্রার্থী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৮) সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা ও ত্রাণ কর্মসূচিতে অপচয় (Wasteful Transfer) : সরকার যোগ্য গরিব ও দুস্থ মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। অনেক সময় দেখা যায় যে এসব প্রকল্পে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সচ্ছল ব্যক্তিরা গরিবদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করে। এই ক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় ঘটে।

৯) অনুপার্জিত মুনাফার ফলে অপচয় (Waste Attributable to Rent-Seeking) : যেকোনো ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলে অথবা সরকারের অনুমতির প্রয়োজন থাকলে অনুপার্জিত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যাদের নাম করে এসব নিয়ন্ত্রণ করা হয় তারা কিন্তু এর ফলে লাভবান হয় না; লাভ কুক্ষিগত করে মধ্যস্বত্বভোগীরা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যেখানেই সরকার 'পারমিট' বা 'লাইসেন্স' প্রবর্তন করে, সেখানেই সরকারি কর্মচারীরা ঘুষ আদায়ের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

এই নিবন্ধের বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে সরকারি অর্থের অপচয় শুধু সরকারের বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমিত নয়। অপচয়ের ব্যাপকতা বাজেটের চেয়ে অনেক বিস্তৃত। অর্থনীতির পরতে পরতে অপচয় ছড়িয়ে রয়েছে। তবে সামগ্রিক অপচয়ের পরিমাপ নির্ণয় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অনেক অপচয়ই দৃশ্যমান নয়। এসব ক্ষেত্রে অপচয়ের পরিমাপ একেবারেই অনুমানের ওপর নির্ভরশীল।

উইলিয়াম স্ট্যানবেরি ও ফ্রেড টমসন কারণের ভিত্তিতে অপচয়কে নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অরিয়ানা বান্দিয়েরা ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করেন যে অপচয়ের ফলে কাদের স্বার্থসিদ্ধি হয়, তার ভিত্তিতে অপচয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তাঁদের মতে, দুই ধরনের অপচয় হলো : (১) সক্রিয় অপচয় ও (২) নিষ্ক্রিয় অপচয়। সক্রিয় অপচয় তখনই ঘটে, যখন কেউ ইচ্ছে করে লাভের জন্য অপচয় ঘটায়। সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি এই শ্রেণির অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। নিষ্ক্রিয় অপচয়ে কারও লাভ হয় না। এ ধরনের অপচয় কয়েকটি কারণে ঘটতে পারে। প্রথমত, যাঁরা সরকারি অর্থ ব্যয় করেন তাঁরা কীভাবে সর্বনিম্ন ব্যয়ে কাজ করতে হয়, তা জানেন না। অর্থাৎ তাঁদের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সরকারি কর্মকর্তাদের নিজেদের লাভের সম্ভাবনা থাকলে তাঁরা সরকারি অর্থের অপচয় নিয়ে মাথা ঘামান না। অপচয় রোধের জন্য সরকারের জারি করা বিধি ও নিয়ন্ত্রণগুলো সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করে। সরকারি কর্মকর্তারা অপচয় রোধের চেয়ে বিধিবিধান প্রতিপালনের ওপর বেশি জোর দেন। কাজেই অপচয় হ্রাসের জন্য কেউ উদ্যোগ নিতে সাহস পায় না। অরিয়ানা বান্দিয়েরা ও তাঁর সহকর্মীরা ইতালিতে ২০০০ থেকে ২০০৫ সময়কালে সরকারি ক্রয়ে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অপচয় সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন।[১০] এই সমীক্ষার মূল বক্তব্যগুলো নিম্নরূপ :

১) ইতালিতে সরকারি কেনাকাটায় অপচয়ের ফলে জাতীয় আয়ের ১.৬ থেকে ২.১ শতাংশ ক্ষতি হয়।

২) অপচয়ের সিংহভাগই নিষ্ক্রিয় অপচয়। এই হিসাব অনুসারে নিষ্ক্রিয় অপচয় হচ্ছে মোট অপচয়ের ৮২ শতাংশ। এর তাৎপর্য হলো যে ইতালিতে সরকারি কেনাকাটায় অপচয়ের মূল কারণ দুর্নীতি নয়। দুর্নীতি অবশ্যই রয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হলো অদক্ষতা ও অযোগ্যতা।

৩) নিষ্ক্রিয় অপচয় সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকারে। আঞ্চলিক সরকারে নিষ্ক্রিয় অপচয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয় অপচয়ের চেয়ে কম। তার চেয়েও কম অপচয় ঘটে স্থানীয় সরকারে। সবচেয়ে কম নিষ্ক্রিয় অপচয় ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের মতো স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে। এ ধরনের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা বেশি থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা বাড়ালেই দুর্নীতি বাড়ে না।

উপরিউক্ত গবেষণার ফলাফল শুধু ইতালির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অন্যান্য দেশেও

একই ঘটনা ঘটছে। তবে এ সম্পর্কে অন্যান্য দেশের উপাত্তের ভিত্তিতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণগুলোতে যেসব অপচয় চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলোর কারণ মোটা দাগে পাঁচ ভাগে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, দুর্নীতির কারণে অপচয় ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত, অদক্ষতা ও অযোগ্যতা অপচয়ের জন্ম দিতে পারে। তৃতীয়ত, সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব অপচয় সৃষ্টি করতে পারে। চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের একই সঙ্গে ভালো ও খারাপ প্রভাব থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অপচয়ের ঝুঁকি সত্ত্বেও প্রকল্প নেওয়া হয়। পঞ্চমত, অতিরিক্ত বিধিনিষেধ অপচয়ের কারণ হতে পারে। উপরিউক্ত বিশ্লেষণের একটি প্রধান দুর্বলতা হলো, এখানে রাজনৈতিক অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অদক্ষতা বা ব্যক্তিদের লোভ-লালসা থেকে অপচয়ের সৃষ্টি হয়। বাস্তবতা হলো, বোকামির জন্য নয়, অতিচালাকির জন্যও অনেক সময় অপচয় সৃষ্টি হয়। এসব অপচয় দূর করা সবচেয়ে দুরূহ।

কোনো অপচয়ই দীর্ঘদিন নিজে নিজে টিকে থাকতে পারে না। ইংরেজিতে একটি আপ্তবাক্যে যথার্থই বলা হয়েছে, কিছু লোককে স্বল্প সময়ের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু সব লোককে সব সময় বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। কাজেই সাধারণত কোনো অপচয় দীর্ঘদিন টিকে থাকার সম্ভাবনা কম। এর অবশ্য একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী অপচয় থেকে লাভবান হয়। তারা নিজেদের স্বার্থে অপচয়কে বাঁচিয়ে রাখে। এসব ক্ষেত্রে অপচয় দূর করতে গেলে শক্ত প্রতিরোধ আসে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মনসুর অলসন এ ধরনের কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর নাম দিয়েছেন distributional coalition বা বণ্টনমূলক জোট।[১১] এরা শুধু সক্রিয় অপচয় (যথা ঘুষ বা দুর্নীতি) থেকেই লাভবান হয় না, এরা নিষ্ক্রিয় অপচয় থেকেও সুবিধা হাসিল করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই অপচয় সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন, পল্লি অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি নতুন এক্স-রে মেশিন বসানো হলো। দেখা গেল, এই মেশিন কাজ করছে না, যদিও যন্ত্রটি ভালো। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, বেসরকারি খাতের এক্স-রে মেশিনের মালিক তাঁর বাজার রক্ষা করার লক্ষ্যে (যে বাজার সরকারি যন্ত্র কেনার আগে তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল) সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রচালককে ঘুষ দেয়, যাতে যন্ত্রটি অচল করে রাখা হয়। আপাতদৃষ্টে এ ক্ষেত্রে অপচয় নিষ্ক্রিয় মনে হলেও আসলে এখানে সক্রিয় অপচয় বিরাজ করছে। কাজেই সব সময় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অপচয়ের মধ্যে প্রভেদ করা অত্যন্ত শক্ত।

উপসংহার

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অপচয় মোটেও অভিনব কিছু নয়। দুই হাজার বছর আগে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে সরকারি কর্মচারীদের অপচয় ও সরকারের অর্থ

আত্মসাৎ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। সরকারি কর্মচারীদের সরকারি অর্থ তছরুপের প্রবণতা লক্ষ করে তিনি লিখেছেন, 'জিবের ডগায় মধু অথবা বিষ এলে যেমন না চেটে থাকা যায় না, তেমনি সরকারি অর্থ যারা নাড়াচাড়া করে, তারা রাজার সম্পদের ছিটেফোঁটা হলেও না খেয়ে থাকতে পারে না।'[১২] যাঁরা রাজার সম্পদ মেরে দিয়ে বড়লোক হন, তাঁদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য (১৯৯২)। সরকারের সম্পদ হেফাজতের জন্য কৌটিল্য সবচেয়ে জোর দিয়েছেন হিসাব নিরীক্ষার ওপর। অর্থশাস্ত্রের বিধান হলো, যদি নিরীক্ষক যথাসময়ে তাঁর দায়িত্ব পালন না করেন, তবে নিরীক্ষককে শাস্তি দিতে হবে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও অপচয় রোধের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে নিরীক্ষা। অবশ্যই জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষার কোনো বিকল্প নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিরীক্ষার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় সংসদকে।

নিরীক্ষা অপচয় বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয়, তবে যথেষ্ট নয়। নিরীক্ষা-ব্যবস্থার কয়েকটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, অপচয় হওয়ার পর নিরীক্ষা হয়। নিরীক্ষা তাই অপচয়ের জন্য শাস্তি দিতে পারে; কিন্তু অপচয় রোধ করতে পারে না। অপচয় ঘটে যাওয়ার পর তা উদ্ঘাটন করে মাত্র। তাই নিরীক্ষকদের সম্পর্কে ঠাট্টা করে বলা হয়ে থাকে, 'নিরীক্ষক হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এবং সব আহত সৈনিকের ওপর বেয়নেট হামলা চালান'। যুদ্ধের ফলাফলের ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের কোনো ভূমিকা নেই। তিনি শুধু ঘটনা-উত্তর জবাবদিহির ব্যবস্থা করেন। তবে অপচয় ঘটার আগে তা রোধ করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বা internal control।

দুর্ভাগ্যবশত, উন্নয়নশীল দেশে নিরীক্ষার চেয়েও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাব্যবস্থা অনেক দুর্বল। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের (২০০০) মূল্যায়ন উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'সম্ভবত, অনেক অনিয়ম ও অবৈধ ব্যয়ের ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে একটি সুবিন্যস্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মেনে চলায় ব্যর্থতা। দৃশ্যত সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে।'[১৩]

সমস্যাটি পদ্ধতির নয়। সমস্যাটি হচ্ছে যাঁরা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তাঁদের। নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত ও সাহসী কর্মকর্তা ছাড়া অপচয় রোধ করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। অথচ অনেক সরকারই এ ধরনের কর্মকর্তা চান না। তাই ঔপনিবেশিক আমলে যে মানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ছিল, তার কাছাকাছি ব্যবস্থাও স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। যাঁদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, তাঁরা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে মার্চ ২০১২ সময়কালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের উদ্যোগে পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে বাংলাদেশে সরকারি অফিসের হিসাবরক্ষণে ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র উদ্ঘাটিত

হয়েছে। ঠিকাদারদের বিল পেতে হলে প্রাপ্য অঙ্কের ৫ থেকে ১০ শতাংশ উৎকোচ দিতে হয়। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের অবসর ভাতার জন্য ১ থেকে ১০ শতাংশ ঘুষ দিতে হয়। বেতনের নতুন স্কেল পেতে হলে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে দৈনিক ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীরা বেতন পায় না (*Financial Express*, August 13, 2012)।

নিরীক্ষাব্যবস্থাও অপ্রতুল। নিরীক্ষকেরা বাইরের লোক। তাঁদের পক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানের সব দুর্বলতা অনুমান করা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর চুটকি প্রচলিত আছে। একবার একজন নিরীক্ষক একটি কারখানা নিরীক্ষার দায়িত্ব নেন। বাজারে গুজব ছিল যে প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিপুল পরিমাণ চুরি হয়। নিরীক্ষক চুরি ধরার জন্য তৎপর হলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তিনি কোনো অনিয়ম দেখতে পাননি। (অবশ্য সব চোর সতর্ক হয়ে গিয়েছিল)। শুধু বিকেলের দিকে একটি রহস্যজনক ঘটনা দেখতে পান। একটি ঠেলাগাড়ি, যার ওপর একটি অস্বচ্ছ কাপড় দিয়ে কী যেন ঢাকা দেওয়া আছে, তোরণের দিকে যাচ্ছে। নিরীক্ষক সঙ্গে সঙ্গে ঠেলাগাড়িটি তোরণের কাছে আটকে দেন। কিন্তু কাপড় তুলে কিছুই পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে ঠেলাগাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হলো। পরদিন একই ধরনের একটি ঠেলাগাড়ি অস্বচ্ছ কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় তোরণের কাছে এল। তাকে আটকিয়ে আবার তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। এভাবে একই ঘটনা পরপর সাত দিন ঘটল। অষ্টম দিন নিরীক্ষক কারখানার নিরীক্ষা শেষ করে যখন তাঁর অফিসে ফিরে যাচ্ছিলেন, তিনি আবার অস্বচ্ছ কাপড়ে ঢাকা একটি ঠেলাগাড়ি দেখতে পান। তিনি ঠেলাগাড়িটি আটকালেন ও গাড়োয়ানকে বললেন, 'আমি আপনার গাড়ি আর পরিদর্শন করব না। আমি বুঝতে পারছি আপনি কাপড় দিয়ে ঢেকে কিছু সরাচ্ছেন। কিন্তু কী সরাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। হলফ করে বলছি, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না। আপনার কাছে আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব, যদি মেহেরবানি করে আপনি কী চুরি করছেন তা আমাকে জানান।' গাড়োয়ান একটু হেসে বলল, 'আমি ঠেলাগাড়ি চুরি করি।' নিরীক্ষক আদৌ সন্দেহ করেননি যে ঠেলাগাড়িও চুরি হয়। ভেতরের খবর না জানলে অর্থবহ নিরীক্ষা সম্ভব নয়। অপচয় রোধ করার জন্য ভেতরের তথ্য ফাঁসকারীদের (whistleblowers) উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তারা সব কেলেঙ্কারি প্রকাশ করে দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক গোপনীয়তার অবগুণ্ঠন অপসারণ করতে হবে। টেলিফোনে অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য জরুরি লাইনের (hotline) ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরীক্ষার মানও উন্নত করতে হবে। বর্তমানে নিরীক্ষা প্রধানত সরকারের ব্যয় ও উপকার পর্যালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সরকার বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানকে শুধু বাজেট বরাদ্দই দেয় না। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকার বিপুল সম্পদও (যথা ভূসম্পত্তি, ভৌত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিনিয়োগ করেছে। সরকারের সম্পদ যথাযথ

কাজে লাগছে কি না, তা-ও নিরীক্ষা করতে হবে। যুক্তরাজ্যে সম্পদভিত্তিক হিসাব ও বাজেট-ব্যবস্থা (Resource accounting and audit) নিয়ে নিরীক্ষা চলছে। এ ধরনের কার্যক্রম অন্যান্য দেশেও গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু টাকা যথাযথ ব্যয় হয়েছে কি না, তা দেখাই যথেষ্ট নয়; টাকাটা কাজে লাগছে কি না, তা-ও দেখতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন কার্যকারিতা নিরীক্ষা (Performance Audit)। দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৫ থেকে ১০ বছর পর প্রকল্পের টেকসই সক্ষমতা বিশ্লেষণও (Sustainability Analysis) করতে হবে।

অবশ্য এসব নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার মতো সম্পদ ও অভিজ্ঞ জনবল অনেক উন্নয়নশীল দেশেরই নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মান্ধাতার আমলের নিরীক্ষাব্যবস্থাও কাজ করছে না। অপচয়ের দীর্ঘদিন পর নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীরা লাপাত্তা হয়ে যায়। প্রশাসনিক অদক্ষতার ফলে নিরীক্ষায় অনিয়ম উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পরও কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। সরকারি হিসাবসংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি বেশির ভাগ সময় অকার্যকর থাকে। অপচয় রোধে সংসদকে এগিয়ে আসতে হবে।

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো প্রয়োজনীয়, তবে যথেষ্ট নয়। যেখানে অপচয় কর্মকর্তাদের অদক্ষতা বা অর্থলিপ্সার ফলে ঘটে, সেখানে এসব ব্যবস্থা কাজ করতে পারে। কিন্তু যেখানে কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠী অনুপার্জিত মুনাফার জন্য অপচয় পয়দা করে, সেখানে কারিগরি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। কায়েমি স্বার্থবাদীরা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মরণপণ লড়াই করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার। দুর্ভাগ্যবশত রাজনীতিবিদেরাও কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অর্থবহ উদ্যোগের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের এগিয়ে আসতে হবে। অপচয় সম্পর্কে তথ্য গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। তবে দেশভেদে সমাধান ভিন্ন হবে। এ ক্ষেত্রে একটি ছোট বালক তার শিক্ষককে যে উপদেশ দিয়েছিল, তা আমাদের মনে রাখতে হবে।

অঙ্কের শিক্ষক ক্লাসে এসে একটি ছোট ছেলেকে প্রশ্ন করল, 'ধরো, আমি তোমাকে এক টাকা দিলাম। তোমার বাবা তোমাকে আরও একটি টাকা দিলেন। বলো তো, বাবা, তোমার কাছে মোট কত টাকা হলো?'

ছেলেটি বলল, 'এক টাকা।'

শিক্ষক বলল, 'ভালো করে চিন্তা করে বলো।'

ছেলেটি আবার বলল, 'এক টাকা।'

শিক্ষক রেগে বললেন, 'তুমি দেখছি অঙ্ক একদম জানো না।'

ছেলেটি বলল, 'স্যার, আমি অঙ্ক ঠিক জানি। কিন্তু আপনি আমার বাবাকে জানেন না। তিনি কোনো দিন আমাকে এক টাকা দূরে থাক, একটি পয়সাও দেবেন না। আমার কাছে আপনার দেওয়া টাকাটাই থাকবে।'

ছাত্রটি শিক্ষককে মনে করিয়ে দিল, বাবাভেদে যোগফল ভিন্ন হতে পারে। তেমনি দেশভেদে অপচয়ের প্রকৃতি ও সমাধান ভিন্ন হবে, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না।

পাদটীকা

১. উদ্ধৃত, Stanbury, Wiliam and Fred Thompson. 1995. 'Towards a Political Economy of Government Waste : First Steps Definitions.' *Public Administration Review*. Vol. 55. No. 5. (Sept-Oct, 1995), P-418

২. Moon, Penderel. 1989. *The British Conquest and Dominion of India*. London : Duckworth. P-819

৩. World Bank. 2000. *Bangladesh : Country Financial Accountability Assessment*. Washington D.C., P-23

৪. সেন, সুকুমার। ২০০৩। ব্যুৎপত্তি *সিদ্ধার্থ বাঙ্গলা কোষ*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৭

৫. Proxmire, Wiliam. 1980. *The Golden Fleece* (New York : W.W. Narton and Co.), P-93

৬. Keynes, John Maynard. 1964. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. New York : Harcourt, Brace and World Inc., P-129

৭. Stanbury, Wiliam and Fred Thompson. 1995. Op.Cit, P-419

৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১৯৯৮। *General Financial Rules*. Dhaka : Finance Division.

৯. Stanbury, Wiliam and Fred Thompson. 1995. Op.Cit.

১০. Bandiera, Oriana; Andrea Prat and Tommaso Valletti. 2009. 'Active and Passive Waste in Government Spending : Evidence From a Policy Experiment.' *The American Economic Review*. Vol. 99. No. 3.

১১. Olson, Mancur. 1982. *The Rise and Decline of Nations*. New Haven : Yale University Press.

১২. কৌটিল্য (Kautilya). 1992. *The Arthasastra*. Translation L.N. Rangarajan. New Delhi : Penguin Books.

১৩. World Bank. 2000. Op.Cit., P-3

রাজনীতি

বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদ : কারণ ও পথরেখা অনুসন্ধান

আলী রীয়াজ

ভূমিকা

সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদ বলতে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোতে এবং নীতিনির্ধারণী আলোচনায় সাধারণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বেআইনি গোপন সংগঠনের সহিংস তৎপরতাকেই বোঝানো হয়। বাংলাদেশে এই ধরনের তৎপরতা এবং এই ধরনের সংগঠনের উপস্থিতি নতুন নয়। তবে ‘সন্ত্রাসবাদ’ এবং ‘জঙ্গিবাদ’ কথাগুলো ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে ২০০৫ সাল থেকে। সে সময় দেশের উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি জেলায়, বিশেষত রাজশাহীর তিনটি উপজেলায় ‘জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ’ (জেএমজেবি) নামে একটি সংগঠনের উত্থান, কথিত ‘চরমপন্থী’দের নিধনে সশস্ত্র তৎপরতা এবং তাদের সঙ্গে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি গোপন সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার প্রেক্ষাপটে এই টার্ম বা প্রত্যয়গুলোর ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেএমবির ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ১৭ আগস্ট সারা দেশে এই সংগঠন কর্তৃক ৪৫০টির বেশি বোমা বিস্ফোরণ এবং পরে বিভিন্ন ধরনের আত্মঘাতী হামলার কারণে এই ধরনের আলোচনা আরও বিস্তৃতি পেয়েছে। এই আলোচনা আরও ব্যাপক আকার লাভ করে ২০১৩ সালের পরে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসী বলে অভিহিত সংগঠনের উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

এই সব সংগঠনের কথিত আদর্শিক অবস্থান যেহেতু রাজনৈতিক ইসলামের একটি ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই এই রকম ধারণা বৃদ্ধি পায় যে সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ সুস্পষ্ট। এই ধারণার পেছনে কেবল যে বাংলাদেশের অবস্থাই কাজ করেছে, তা নয়। ২০০১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কথিত ‘ওয়ার অন টেরর’-এর প্রেক্ষাপটে

বৈশ্বিকভাবে এমন ধারণাই তৈরি করা হয়েছে, যার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে। সেই সময়ে যে প্রশ্নগুলো জরুরি হয়ে ওঠে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কীভাবে এই নতুন প্রপঞ্চকে (ফেনোমেনা) ব্যাখ্যা করা হবে, কোন ধরনের পরিস্থিতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গোষ্ঠীগত সহিংসতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, এই ধরনের সহিংস আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট পথরেখা আছে কি না এবং ধর্ম এই প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে কি না। এই প্রশ্নগুলো যেকোনো দেশের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য; বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি বলে যে ধরনের তৎপরতা চলমান, তা বোঝার জন্যও এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা দরকার।

বাংলাদেশে সহিংস আদর্শে উজ্জীবিত ও সক্রিয় সংগঠনের উপস্থিতি দীর্ঘদিনের। তবে পদ্ধতিগতভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার নজির কম। বাংলাদেশে 'সন্ত্রাসবাদ' বা 'জঙ্গিবাদ'বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণনামূলক অথবা এ বিষয়ে জনসাধারণের মনোভাববিষয়ক জরিপভিত্তিক। তদুপরি বাংলাদেশের সমাজে 'জঙ্গিদের' বিষয়ে এবং 'জঙ্গি' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু পূর্বধারণা আসন গেড়ে বসেছিল। দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা এবং মাদ্রাসাশিক্ষায় শিক্ষিতেরাই কেবল সহিংস উগ্রবাদে যুক্ত বলে মনে করা হতো। ২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলাকারীদের পরিচয় নাটকীয়ভাবে এই ধারণার অসংগতির দিকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এই বিষয়ে গবেষণাভিত্তিক, পদ্ধতিগতভাবে শক্তিশালী এবং তাত্ত্বিক বিবেচনায় সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে স্বল্প। পৃথিবীর অন্যত্র উগ্রবাদ নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছিল, সেগুলো বিবেচনায় নিলে এই ধরনের ভুল ধারণা কমাতে সাহায্য করত।

এই প্রেক্ষাপটে এই নিবন্ধে আমার লক্ষ্য চারটি; প্রথমত সহিংস উগ্রবাদ বিষয়ে ধারণা দেওয়া; দ্বিতীয়ত উগ্রবাদ বোঝার জন্য একটি তত্ত্বগত কাঠামো উপস্থাপন করা; তৃতীয়ত বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের বিভিন্ন ধারার পথরেখা চিহ্নিত করা এবং চতুর্থত প্রস্তাবিত তত্ত্বকাঠামোর আলোকে বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের কারণের দিকে মনোনিবেশ করা।

সহিংস উগ্রবাদ

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিবাদ শব্দ দুটিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জঙ্গি প্রত্যয়টি ব্যবহার করা সম্ভব তাদের ব্যাপারে, যারা একধরনের আগ্রাসী মনোভাব বা আচরণ করে। কিন্তু এই আগ্রাসী মনোভাব সহিংস না-ও হতে পারে। অর্থাৎ জঙ্গি মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সহিংস ঘটনা না-ও ঘটাতে পারে। ফলে জঙ্গিবাদ কথাটি মনোভাব ও আচরণ—দুটোই ধারণ করতে পারে বলা যাবে না। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয়, সুনির্দিষ্ট

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্বিচার হামলা চালানো এবং সহিংসতাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। এগুলো হচ্ছে প্রচলিত ব্যাখ্যা। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কোনোটিরই কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। এলেক্স স্মিড ২০০৪ সালে বিদ্যায়তনিক জগৎ বা একাডেমিয়ায় যাঁরা যুক্ত, তাঁদের মধ্যে চালানো এক গবেষণায় দেখান যে সন্ত্রাসবাদের অন্ততপক্ষে ১২০টি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আছে (স্মিড ২০০৪)।

এগুলোর বাইরে নীতিনির্ধারকেরা ভিন্ন ধরনের সংজ্ঞাও ব্যবহার করেন। লিওনার্ড ওয়াইনবার্গ, এমি পেডাহজুর এবং সিভেন হার্স-হেফলার তিনটি বিদ্যায়তনিক জার্নালে ১৯৭৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ৫৫টি গবেষণায় ৭৩টি সংজ্ঞা খুঁজে পান (ওয়াইনবার্গ, পেডাহজুর এবং হার্স-হেফলার ২০০৪)। জেফরি সাইমন ১৯৯৪ সালে যে ২১২টি সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে নীতিনির্ধারকেরা ব্যবহার করেন ৯০টি (সাইমন ১৯৯৪)। সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে সংজ্ঞার পার্থক্যই কেবল নয়; আমরা এ-ও জানি যে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকেও কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে সন্ত্রাসবাদ, একজন মুক্তিযোদ্ধাও কারও দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী। রাজনৈতিক অবস্থানই বলে দেয় কে কাকে সন্ত্রাসবাদ বলে চিহ্নিত করবে। ২০০১ সালের পরে সন্ত্রাসবাদ শব্দটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমা গণমাধ্যম, নীতিনির্ধারক, এমনকি একাডেমিকরাও এতটাই নির্বিচার হয়েছেন এবং এমনভাবে তা ব্যবহার করেছেন, যাতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তা অন্যায্যভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। যারা সহিংসতায় যুক্ত, তাদের চরিত্র ও লক্ষ্য বোঝার বদলে তাদের ব্যাপারে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গিই বোঝা গেছে।

তাই এই দুটি টার্ম ব্যবহার না করে লেখাটিতে আমি রাজনৈতিক সহিংসতার একটি ধারাকে সহিংস উগ্রবাদ বা ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম বলে বর্ণনা করব। সহিংস উগ্রবাদ বলতে আমি বোঝাব সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আদর্শিকভাবে অনুপ্রাণিত সহিংসতার প্রতি সমর্থন, তার জন্য প্রস্তুতি, তাতে অংশগ্রহণ করা অথবা তাকে যৌক্তিক প্রতিপন্ন করাকে। এই সংজ্ঞা যদিও অত্যন্ত ব্যাপক, তথাপি এর সুবিধা হচ্ছে এটি বিশেষ কোনো ধর্ম বা আদর্শের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করছে না।

প্রাসঙ্গিকভাবে সহিংস উগ্রবাদের সঙ্গে র‍্যাডিক্যালিজমের যে সম্পর্ক আছে, তার কথাও মনে রাখতে হবে। র‍্যাডিক্যালিজমের দুটো দিক রয়েছে—একটি হচ্ছে চিন্তা বা মনোভঙ্গির, অন্যটি হচ্ছে আচরণের বা কার্যক্রমের (স্মিড ২০১৩, ৮)। প্রথমটি হচ্ছে জ্ঞানগত (বা কগনিটিভ), এর অর্থ হচ্ছে বর্তমান অবস্থা অগ্রহণযোগ্য এবং মৌলিকভাবে ভিন্ন বিকল্প আছে দৃঢ়ভাবে এই বিবেচনা থেকে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষাবলম্বন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আচরণের (বিহেভিয়ারাল) দিক থেকে সেই পরিবর্তনের লক্ষ্য সক্রিয় হওয়া। এই সক্রিয়তা হতে পারে অহিংস ও গণতান্ত্রিক (যেমন সংস্কারের মাধ্যমে) অথবা সহিংসতার মাধ্যমে (যেমন বল প্রয়োগ করে বা বিপ্লবের মাধ্যমে)

(স্মিড ২০১৩, ৮)। সহিংস উগ্রবাদে আচরণের সহিংসতাই প্রধান, কিন্তু তার পেছনে যে জ্ঞানগত (বা কগনিটিভ) দিক উপস্থিত থাকে, সেটা স্মরণ রাখা দরকার।

আদর্শিকভাবে র‍্যাডিক্যালিজমকে গ্রহণ করার যে প্রক্রিয়া, তাকে বলা হয় র‍্যাডিক্যালাইজেশন। র‍্যাডিক্যালাইজেশন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি এমন ধরনের আদর্শ ও বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হন, যা তাঁকে মধ্যপন্থী, মূলধারার চিন্তাধারা থেকে চরমপন্থী চিন্তার দিকে সরে যেতে সাহায্য করে। সহিংস র‍্যাডিক্যালাইজেশনের পথ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহিংসতাকে কেবল যৌক্তিক বলেই বিবেচনা করে না, সহিংসতাকেই প্রধান এবং একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়; সেভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করে। সহিংস উগ্রবাদের প্রপঞ্চকে বোঝা এবং তা মোকাবিলা করার জন্য দরকার এর কারণ এবং প্রক্রিয়াটি উপলব্ধি করা।

র‍্যাডিক্যালাইজেশন প্রক্রিয়া : একটি তাত্ত্বিক কাঠামো

সহিংস উগ্রবাদ প্রত্যয়টি সাম্প্রতিক কালে ব্যবহৃত হলেও এই প্রবণতার বিষয়ে আলোচনার ধারা নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই 'সন্ত্রাসবাদ' এবং 'র‍্যাডিক্যালাইজেশন'-এর বিভিন্ন দিক বোঝার জন্য গবেষকেরা চেষ্টা করে আসছেন। একটি দেশে কেন জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ বা সহিংস উগ্রপন্থা বিস্তার লাভ করে, কেন এ ধরনের আদর্শ মানুষকে আকর্ষণ করে, কারা এই ধরনের আদর্শের প্রতি আকর্ষিত হয়—কয়েক দশক ধরেই এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন সমাজবিজ্ঞানী, নিরাপত্তাবিষয়ক গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারকেরা।

গত শতকের ষাটের দশকে প্রথম এই বিষয়ে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায় যখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তৈরি হয় এবং বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের পথে সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু তার আগেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ হিসেবে কেন সহিংসতা ব্যবহৃত হয় (যেমন আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি, বাস্ক গেরিলাদের সংগঠন) সেটা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। গত শতকের সত্তরের দশকে ইতালির রেড ব্রিগেড, জার্মানির বাদের-মেইনহফ, জাপানে রেড আর্মি বিষয়ে যাঁরা গবেষণা অনুসরণ করেছেন, সেসব গবেষকও এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন।

সহিংস র‍্যাডিক্যালাইজেশন বিষয়ে ২০০১ সালের পরে গবেষণার সংখ্যা বেড়েছে এবং দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। সহিংস উগ্রপন্থা নিঃসন্দেহে এককভাবে কোনো অঞ্চলের বা বিশেষ কোনো ধর্মের ক্ষেত্রে সীমিত নয়। কিন্তু ২০০১ সালের পরে এসব আলোচনা ও গবেষণায় যেটা প্রাধান্য পেয়েছে, তা হচ্ছে ইসলামপন্থী সহিংস উগ্রবাদী সংগঠনগুলোর উত্থান এবং বিস্তার, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর প্রতি আকর্ষণের বিষয়। এ দিকটি আরও বেশি

গুরুত্ব পেয়েছে ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) উত্থান এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আইএসে যোগ দেওয়ার পরে। শুধু তা-ই নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য দেশেও সমাজের ভেতরে র‍্যাডিক্যালাইজেশনের প্রবণতা বেড়েছে। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী সহিংস উগ্রপন্থীদের উত্থান সহজেই লক্ষণীয়।

র‍্যাডিক্যালাইজেশন-বিষয়ক আলোচনাগুলোতে প্রধানত দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। একটি হচ্ছে র‍্যাডিক্যালাইজেশনের কারণ এবং অন্যটি র‍্যাডিক্যালাইজেশনের প্রক্রিয়া। গবেষকেরা চেষ্টা করছেন কতকগুলো সাধারণ প্রবণতা বা স্তর চিহ্নিত করতে; এগুলো গড়ে উঠেছে কেস স্টাডির ভিত্তিতে। এর একটি দুর্বলতার দিক হচ্ছে র‍্যাডিক্যালাইজেশন প্রক্রিয়াবিষয়ক বেশির ভাগ কেস স্টাডি পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর, বিশেষত তরুণদের, র‍্যাডিক্যালাইজেশনের পথ বোঝার আগ্রহ থেকেই তৈরি হয়েছে। গত প্রায় দুই দশকে এর সঙ্গে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা যুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এই দুর্বলতা একেবারে তিরোহিত হয়ে যায়নি।

র‍্যাডিক্যালাইজেশনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যেসব গবেষণা হয়েছে, তার প্রথম দিকের গবেষণায় গবেষকেরা কিছু সাধারণ উপসংহারে উপনীত হন। তাতে ধারণা দেওয়া হয় যে সহিংস উগ্রবাদের, যাকে অধিকাংশ গবেষণায় সন্ত্রাসবাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিছু অন্তর্নিহিত (আন্ডারলায়িং) কারণ আছে, অন্যভাবে বললে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল কারণ রয়েছে। কিন্তু আরও সুনির্দিষ্ট, বাস্তবতানির্ভর ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণার পরে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের মূল কারণ চিহ্নিত করার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন একই রকমের আর্থসামাজিক অবস্থা সবাইকে 'সন্ত্রাসী' করে তুলছে না। তা ছাড়া যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী কাজে যুক্ত হয়, তারা কেবল পরিস্থিতির চাপে যোগ দেয় না, ক্ষেত্রবিশেষে কিছুর আকর্ষণে যুক্ত হয়। সেটা বিশেষ করে কোনো নেতার আকর্ষণ হতে পারে, হতে পারে যে এই ধরনের সংগঠন তাকে এমন কিছু দিতে পারে, যা তাকে সমাজের অন্য কোনো সংস্থা, পরিবার বা বন্ধু দিতে পারছে না। তা ছাড়া মানুষ স্বেচ্ছায় অনেক কিছু করে, কেবল পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করে না। 'মূল কারণ' অনুসন্ধানচেষ্টার একটা বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে, ধরে নেওয়া হয় যে সম্ভাব্য সহিংস উগ্রবাদীরা কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা দিয়ে প্রভাবিত হয়।

এসব দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে গবেষণার যে নতুন ধারা গড়ে ওঠে, তাতে দেখা যায় বিভিন্ন দেশে যেখানে সহিংস উগ্রবাদ প্রসারিত হয়েছে, যেসব ব্যক্তি এই ধরনের আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছে, যেসব উগ্রবাদী সংগঠন শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে, সেসব জায়গায় সহিংস উগ্রবাদী হয়ে ওঠা এবং এই আদর্শের প্রসারের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় চালক বা ড্রাইভারের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো ব্যক্তিকে সহিংস কার্যক্রমের পথে ঠেলে দিতে ভূমিকা নেয়, সমাজে সহিংসতার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে এবং এই

ধরনের সংগঠন তৈরি করে। এই ড্রাইভার বা চালকগুলোকে ভাগ করা হয়েছে চারটি ভাগে—অভ্যন্তরীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈশ্বিক।

অভ্যন্তরীণ চালকের মধ্যে রয়েছে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্নতা বা প্রান্তিকতা অনুভব করা, সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়া, হতাশার বোধ, অন্যদের তুলনায় বঞ্চিত অনুভব করা। রাজনৈতিক চালকগুলোর মধ্যে আছে রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, সরকারের কঠোর নিপীড়ন ও সুস্পষ্টভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের দায়মুক্তির ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে অব্যাহত সংঘাত, সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এলাকা তৈরি হওয়া। সাংস্কৃতিক চালকের মধ্যে আছে এই ধারণা বিরাজ করা বা তৈরি হওয়া যে তার আত্মপরিচয়ের ভিত্তি বা ধর্ম আক্রমণের কিংবা বিপদের মুখোমুখি, নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হুমকির মুখে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিজের সংস্কৃতির বিকাশ বা সমাজে অন্যদের ওপরে নিজের ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়া।

বৈশ্বিক চালকের মধ্যে আছে নিজেদের ভিকটিম বলে মনে করা। একার্থে এটি সাংস্কৃতিক চালকের সঙ্গে যুক্ত। যেমন ইসলামপন্থীদের কাছে মনে হয় ইসলাম বিপদের মুখে; এই ধারণার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় যে মুসলিম জনগোষ্ঠী অন্যত্র অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার, তখন তা একাদিক্রমে দুই ধরনের চালকের উপাদান হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে যদি এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে বিশ্বব্যবস্থা মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য অন্যায্য, তাহলে তা এক শক্তিশালী চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ ছাড়া বৈশ্বিক চালকের আরেকটি হচ্ছে 'কাছের শত্রু-দূরের শত্রু'র ধারণা। যখন অভ্যন্তরীণভাবে দেশের ভেতরে নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়, যখন 'কাছের শত্রু'কে পরাজিত করতে সক্ষম হয় না, তখন দেশের বাইরে 'দূরের শত্রু'র বিরুদ্ধে তাদের অভিযান চালানোর আগ্রহ তৈরি হয়। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রু বলে বিবেচনা করে, তার কারণগুলোর মধ্যে নিপীড়ক সরকারগুলোর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সমর্থন অন্যতম বলেই তাদের দলিলপত্র, প্রচারণা ও সদস্য সংগ্রহের প্রচারণায় স্পষ্ট।

গবেষকেরা বলছেন, এই চালকগুলো একক ও সম্মিলিতভাবে কাজ করে এবং সব জায়গায় সব কটি না থাকলেও তার কার্যকারিতা অক্ষত থাকে বলেই দেখা গেছে (এই চালকগুলো বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার বিস্তারিত বর্ণনা এবং আলোচনার জন্য দেখুন ইউএসএআইডি ২০০৯)।

র‍্যাডিক্যালাইজেশনের পথ হিসেবে গত কয়েক দশকে যে মডেলগুলো প্রস্তাবিত ও আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে চারটি—ডেনিশ গোয়েন্দা সংস্থার প্রস্তাবিত মডেল (পিইটি মডেল), নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের জন্য মিচেল ডি সিলবার ও অরবিন্দ ভাটের তৈরি করা মডেল (এনওয়াইপিডি মডেল), মার্ক সেইজম্যানের

মডেল ('একগুচ্ছ লোক' মডেল) এবং মনোবিজ্ঞানী ফাতালি মোঘাদ্দামের মডেল (স্টেয়ারকেস মডেল) (এই মডেলগুলোর সারাংশ ও সমালোচনার জন্য দেখুন, বোরাম ২০১১)। এসব মডেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো র‍্যাডিক্যালাইজেশনকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছে এবং সেই স্তরগুলোর মধ্যে একধরনের পর্যায়ক্রমিকতার দিকে ইঙ্গিত করেছে। যদিও এটাও বারবার বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ায় একবার শামিল হলেই তিনি চূড়ান্ত পর্যায় অর্থাৎ সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অংশ নেবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, বরং অধিকাংশই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই ঝরে পড়বে, তথাপি এই স্তর বিন্যস্ত প্রক্রিয়া যে একধরনের 'কনভেয়র বেল্টের' ধারণার বশবর্তী, সেটা স্পষ্ট (রীয়াজ ২০১৬ক, ২০১৬খ, ২০১৬গ, ২০১৬ঘ)।

এই ধরনের প্রক্রিয়ার ধারণার বিপরীতে মোহাম্মদ হাফেজ এবং ক্রাইটন মালিন্স ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা ও কাঠামো উপহার দেন (হাফেজ ও মালিন্স ২০১৫)। প্রথমত তাঁরা চিন্তাগত র‍্যাডিক্যালাইজেশন (রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সহিংসতার পক্ষে যুক্তি প্রদান) এবং কার্যক্রমগত র‍্যাডিক্যালাইজেশনের (বৈধ সক্রিয়তা থেকে শুরু করে সন্ত্রাসী হামলায় অংশ নেওয়া পর্যন্ত) মধ্যে পার্থক্য করেন। এটি একার্থে কগনিটিভ এবং বিহেভিয়ারাল পার্থক্য। দ্বিতীয়ত র‍্যাডিক্যালাইজেশনের প্রক্রিয়া বোঝাতে তাঁরা ধাঁধার (পাজল) রূপক ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, এই ধাঁধার চারটি টুকরা আছে। এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ক্ষোভ; নেটওয়ার্ক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ; সহযোগিতার কাঠামো এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ (personal and collective grievances, networks and interpersonal ties, support structure and political or social ideology)। তাঁরা বলছেন, যেকোনো জিগস পাজলে (Zigsaw puzzle) বিভিন্ন টুকরা যেমন একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত এবং এগুলোর সম্মিলিত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল পুরো ছবিটি স্পষ্ট হয়, তেমনি এই চারটি উপাদানের সম্মিলনেই র‍্যাডিক্যালাইজেশন সম্পন্ন হয়। র‍্যাডিক্যালাইজেশনের প্রক্রিয়া বিষয়ে এই ব্যাখ্যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই প্রক্রিয়া একরৈখিক নয়, বহু কারণসম্পন্ন এবং তা পটভূমি-সংশ্লিষ্ট (বা contextualized)।

সহিংস উগ্রবাদ এবং র‍্যাডিক্যালাইজেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে কনটেক্সট বা পটভূমির বিষয়টি যতটা মনোযোগ দাবি করে, বহুল প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলোতে তাতে ততটা গুরুত্ব পায়নি। ম্যাথিউ ফ্রান্সিস (ফ্রান্সিস ২০১২) এই বিষয়ের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে মার্থা ক্রেনশর (ক্রেনশ ১৯৮১) গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ফ্রান্সিস র‍্যাডিক্যালাইজেশনের কারণগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেন—পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত উপাদান, কৌশলগত উপাদান ও আদর্শিক উপাদান। ক্রেনশ এবং ফ্রান্সিসের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, এই উপাদানগুলোর মধ্যে আবার উপবিভাগ রয়েছে। যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত উপাদানের কিছু হচ্ছে পূর্বশর্ত

আর কিছু এ ধরনের প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করে। কৌশলগত উপাদানকে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি হিসেবে ভাগ করা যায়। তৃতীয় উপাদান হচ্ছে আদর্শিক, যেগুলো হচ্ছে অপরিবর্তনীয়। এই উপাদানগুলোকে আমরা হাফেজ ও মালিন্স (২০১৫)-এর প্রস্তাবিত পাজলের বিভিন্ন টুকরা বলে বিবেচনা করতে পারি (সারণি-১)।

সারণি-১
র‍্যাডিক্যালাইজেশনের কারণ

বিভাগ	উপবিভাগ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত	পূর্বশর্ত	অনুকূল	আধুনিকায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন, যেমন ইন্টারনেট
		অনুপ্রেরণামূলক	বর্ণগত ও ধর্মীয় বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা
	ত্বরান্বিতকরণ		পররাষ্ট্রনীতি, যেমন ইরাক যুদ্ধ
কৌশলগত	দীর্ঘমেয়াদি		পশ্চিমা আধুনিকতার ধারণা ও নৈতিকতার পরাজয়
	স্বল্পমেয়াদি		লক্ষ্যের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ, ভীতি সঞ্চার
আদর্শিক			সমাজের জন্য কী ইতিবাচক, সেই বিষয়ে আপসহীন অবস্থান

সূত্র : ফ্রান্সিস, ২০১২

র‍্যাডিক্যালাইজেশনের কারণ বিষয়ে বর্ণিত চালকসমূহ, হাফেজ ও মালিন্স-এর পাজল তত্ত্ব এবং ফ্রান্সিসের উপস্থাপিত মডেলের সমন্বিত রূপ এই প্রবন্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের বিভিন্ন পর্যায়

বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের একটি ধারার উদ্ভব ঘটে স্বাধীনতার পরপরই। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় যাঁরা প্রবাসী সরকারের অধীন হয়ে যুদ্ধ করেননি বা

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের আদর্শে বিশ্বাস করেননি, তাঁদের এক বড় অংশ স্বাধীনতার পরে সশস্ত্র সাংগঠনিক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সর্বহারা পার্টি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি—মার্ক্সবাদী বা লেনিনবাদী, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন ধরনের মাওবাদী সংগঠন। এর বাইরে মাওবাদী আদর্শে উজ্জীবিত কিছু সংগঠন যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা এবং পাকিস্তানি সরকারের সঙ্গে যারা সহযোগিতা করেছিল, সেই সংগঠনগুলোর কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের উগ্রবাদী আদর্শের আওতায় সহিংসতা অব্যাহত রেখেছে। এগুলো সাধারণত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর পেছনে র‍্যাডিক্যাল আদর্শ এবং রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামো বদলের একমাত্র উপায় হিসেবে সহিংসতাকেই বিবেচনা করে এমন সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি ছিল। এর মাত্রা বোঝার জন্য এটা উল্লেখ করা যথেষ্ট যে ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক টেলিভিশন ভাষণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জানান, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের চারজন সাংসদসহ তিন হাজার কর্মী নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করে, যার বিরুদ্ধে বিরোধীদের নিপীড়ন এবং হত্যাকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই দাবি করা হয় যে তাদের ৬০ হাজার কর্মী নিহত হয়।

শাসনের ধরন হিসেবে ক্রমবর্ধমান নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়া, গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আসা এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন বাহিনী (যেমন লাল বাহিনী) গঠন উগ্রবাদী চিন্তার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রসারিত করে। ১৯৭৪ সালে অন্যতম বিরোধী দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এবং সরকারের বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের মুখোমুখি হচ্ছিল। তারা গোপন সশস্ত্র সংগঠন গণবাহিনী গড়ে তোলে। এটি বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের রাজনীতির ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। ১৯৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া হিসেবে উগ্রবাদী সংগঠনগুলো একধরনের যৌক্তিকতা লাভ করে।

১৯৭৫ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত উপর্যুপরি রক্তক্ষয়ী সেনা অভ্যুত্থানসমূহ কেবল যে শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবার ও দলের নেতাদের নির্মমভাবে হত্যাই করে তা নয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোও বদলে দেয় (রীয়াজ ২০০৬)। এরপরে দীর্ঘদিন ধরে দেশে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করেছিল, কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে সেই সময়ে সহিংস উগ্রবাদী সংগঠনগুলো ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে; রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং অর্থনীতি ও সমাজে পরিবর্তন এর অন্যতম কারণ। এই সব সংগঠনের আদর্শিক পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ কলহও এই দুর্বলতাকে ত্বরান্বিত করে। বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী

সহিংস উগ্রবাদী দলগুলো দেশের পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের কয়েকটি অঞ্চলে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হিসেবে সাংগঠনিকভাবে উপস্থিত থাকলেও আদর্শিক এবং সাংগঠনিকভাবে তাদের আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল খুব সীমিত। ১৯৮০-এর দশকে জেনারেল এরশাদের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় মূলধারার রাজনীতিতে সহিংসতা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ জোরদার হওয়া সত্ত্বেও সহিংস উগ্রবাদের বিস্তার লক্ষ করা যায় না।

বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের বড় ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে ১৯৯০-এর দশকে, ইসলামপন্থী সহিংস সংগঠন পাকিস্তানভিত্তিক হরকাতুল জিহাদ-আল-ইসলামের (হুজি) শাখা প্রতিষ্ঠা এবং এর বিকাশের মধ্য দিয়ে। হুজি বাংলাদেশে প্রথম বিস্তার লাভ করে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২-এর মধ্যে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত 'মুজাহিদ' এবং পরে তালেবানের পক্ষে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া কথিত 'স্বেচ্ছাসেবকেরা' হুজির আওতায় সংগঠিত হয় এবং ১৯৯২ সালের এপ্রিলে প্রকাশ্যে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাংগঠনিকভাবে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়। বাংলাদেশে ইসলামপন্থী সহিংস উগ্রবাদের উৎসমুখ হয়ে ওঠে হুজি। এই সংগঠনের প্রভাব বিস্তার লাভ করে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে, যেমন ১৯৯৬ সালে জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সঙ্গে হুজির সম্পর্ক স্থাপিত হয় (রীয়াজ ২০০৮)। অন্যদিকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য সহিংস উগ্রবাদীদের দেশের বাইরে যোগাযোগ শুরু হয় ১৯৯৭-৯৮ সালে। পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তাইয়েবার শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় নাগরিক আবদুল করিম টুন্ডার সঙ্গে শায়খ আবদুর রহমানের ১৯৯৬ সালে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা এ দেশে সহিংস উগ্রবাদের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ১৯৯৪ সালে টুন্ডা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তাঁর হাত ধরেই জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুর রহমান পাকিস্তানে প্রশিক্ষণের জন্য যান এবং মারকাজ আদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ, যা লস্কর-ই-তাইয়েবার উৎস সংগঠন, এর সঙ্গে যুক্ত হন, পরিচিত হন হাফিজ সাঈদের সঙ্গে (রীয়াজ, ২০১৫ক; রীয়াজ ২০১৫খ)। এই ধারাই পরে বাংলাদেশ সহিংস উগ্রবাদী কার্যক্রমের বিভিন্ন উপধারায় বিভক্ত হয়।

১৯৯০-এর দশক থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ইসলামপন্থী সহিংস উগ্রবাদী ধারায় পরিবর্তন ঘটেছে, এর কারণ বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ—দুই-ই। বৈশ্বিক কারণের ভেতরে আছে ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আল-কায়েদার হামলার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের কথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', আফগানিস্তানে তালেবানের পতন ও আল-কায়েদাকে উৎখাত এবং ইরাক ও সিরিয়ার একাংশ নিয়ে ইসলামিক স্টেটের উত্থান ও পতন (রীয়াজ ২০১৭ক, রীয়াজ ২০১৭খ, রীয়াজ ২০১৭গ, রীয়াজ ২০১৭ঘ)। অন্যদিকে আছে বাংলাদেশে আল-কায়েদা ও আইএসের উপস্থিতি ও হামলা, অন্যান্য সহিংস উগ্রবাদী

সংগঠনের উত্থান, মূলধারার রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এবং গণতন্ত্রায়ণের পথে যাত্রা ও বিচ্যুতি। এই সব পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যেসব সহিংস উগ্রবাদী দেখা গেছে, তাদেরকে পাঁচ প্রজন্মে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম প্রজন্ম হচ্ছে যারা আফগান যুদ্ধে (১৯৭৯-৯২) অংশগ্রহণ করেছে। এরাই ১৯৯২ সালে হুজি-বাংলাদেশ গড়ে তোলে। আকারে সীমিত এই গোষ্ঠীর সদস্যরা ছিলেন প্রধানত বয়স্ক, তাঁদের এক বড় অংশই আসেন দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে এবং এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির পাশাপাশি মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় প্রজন্ম হচ্ছে, যাঁরা ১৯৯৬ সালের পরে স্থানীয়ভাবে র‍্যাডিক্যাল পথ অনুসরণে অগ্রসর হয়ে ১৯৯৮ সালে জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের এক বড় অংশই আহলে হাদিসের অনুসারী। এঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাই ২০০৫ সালে জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের (জেএমজেবি) নামে রাজশাহী এলাকায় সহিংসতায় অংশ নেন। হুজি বাংলাদেশের সঙ্গে এঁদের সাংগঠনিক সখ্য ছিল এবং এঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে 'ইসলামি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা। ২০০৫ সালে সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণ এবং আত্মঘাতী হামলা চালায় এই সংগঠন।

তৃতীয় প্রজন্মের উত্থান ঘটে ২০০১ সালের পরে, এরা হিযবুত তাহ্‌রীর নামের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা হচ্ছে বৈশ্বিকভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এঁরা প্রধানত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে আসা এবং প্রযুক্তি, বিশেষত যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন। চতুর্থ প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে ২০০৭ সালের পরে। ২০০৬-২০০৭ সালে জেএমবির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, শীর্ষ নেতাদের আটক, বিচার, ফাঁসিসহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপের কারণে সাংগঠনিকভাবে জেএমবি দুর্বল হয়ে পড়ে। হুজি এবং জেএমবির সদস্যরা পুনরায় সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা চালায় এবং এই সময়েই আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) উদ্ভব হয়; গোড়াতে এর নাম ছিল জামায়াতুল মুসলেমিন, পরে এটি আনসার আল ইসলাম নামে পরিচিত হয়। আনওয়ার আল আওলাকির বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মুফতি জসিমুদ্দিন রাহমানির নেতৃত্বে সংগঠিত এই গোষ্ঠীর সদস্যরা ২০১২ সাল থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে এবং ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে শাহবাগ আন্দোলনের সময় ব্লগার রাজীব হায়দারকে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে। এদের সদস্যদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির, প্রধানত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন। তবে তাদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের সংশ্লিষ্টতা লক্ষণীয়।

যদিও আল-কায়েদার সঙ্গে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালের দিকেই, কিন্তু ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে—আল-কায়েদা ইন

ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট (একিউআইএস) ঘোষিত হলে ২০১৫ সালে আল-কায়েদার একটি বাংলাদেশ শাখা গড়ে ওঠে; মাওলানা মাইনুল ইসলাম এবং মাওলানা জাফর আমিন এর নেতৃত্বে ছিলেন বলে জানা যায়। পরে এবিটি এবং আল-কায়েদার আনুষ্ঠানিক শাখা একীভূত হয়। এর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের অনুসারী পঞ্চম প্রজন্মের সূচনা। ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেটের উত্থানের পরে বাংলাদেশে আইএসের অনুসারীরা সংগঠিত হন। এর সঙ্গে যুক্ত হন দেশের বাইরে থাকা এবং ইরাকে ও সিরিয়ায় আইএসের হয়ে লড়াই করা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণেরা (রীয়াজ ২০১৬; রীয়াজ ও পারভেজ ২০১৮)। এঁরাই পঞ্চম প্রজন্মের অংশ হয়ে ওঠেন।

বাংলাদেশ সরকার ইসলামিক স্টেটের উপস্থিতি অস্বীকার করে এবং তাঁদেরকে 'নব্য জেএমবি' বলে বর্ণনা করে থাকে, কিন্তু এই ধরনের সংগঠন বিষয়ে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে খবর রাখেন, তাঁরা জানান, '"নব্য জেএমবি" নিজেদের আইএস দাবি করে। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে পুরোনো জেএমবির অনেক তফাত। নব্য জেএমবির সদস্যদের একটা বড় অংশ আধুনিক, বিত্তবান পরিবারের সন্তান, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আইএস যাদের শত্রু মনে করে, এরাও তাদের শত্রু মনে করে। এরাই এ দেশে প্রথম শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করে। এ ছাড়া একের পর এক পুরোহিত, সেবায়েত, বৌদ্ধ ভিক্ষু, খ্রিষ্টধর্মের মানুষ ও বিদেশি নাগরিককে হত্যা করে। এসব হত্যার পর নিহতদের "ক্রুসেডার" আখ্যা দিয়ে আইএসের নামে দায় স্বীকার করা হয়' (সুলতান ২০১৬)।

বাংলাদেশে কেবল এই কয়েকটি সহিংস উগ্রবাদী দলই আছে তা নয়। কোনো কোনো গণমাধ্যম এই সংখ্যাকে দুই ডজনের বেশি বলে দাবি করে। তবে তাদের প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব নয়। ২০০৩ থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার হুজি-বাংলাদেশ এবং জেএমবিসহ মোট আটটি ইসলামপন্থী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যারা সহিংস উগ্রবাদী বলে পরিচিত। এগুলো হচ্ছে শাহাদাত-ই-হিকমা (২০০৩), জেএমবি (২০০৫), জেএমজেবি (২০০৫), হুজি-বাংলাদেশ (২০০৫), হিযবুত তাহ্‌রীর (২০০৯), আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (২০১৫), আনসার-আল-ইসলাম (২০১৭) এবং আল্লাহর দল (২০১৯)। কিন্তু শুধু ইসলামপন্থী সহিংস উগ্রবাদী দলই নয়, নিষিদ্ধ করা হয়েছে বামপন্থী কিছু দলকেও। এর মধ্যে আছে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (এম এল-লাল পতাকা), নিউ পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি এবং কাদামাটি।

ধর্ম ও সহিংস উগ্রপন্থা

বাংলাদেশের ইসলামপন্থী সহিংস উগ্রবাদী দলগুলোর সাম্প্রতিক কালের তৎপরতা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য এটা বলা নয় যে সহিংস উগ্রবাদের সঙ্গে ধর্মের, বিশেষ

করে ইসলামের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। এই ধরনের কথাবার্তা ২০০১ সালের ৯/১১-এর পরে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে; 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের' প্রবক্তাদের অনেকেই ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের ওতপ্রোত যোগাযোগের কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেই বলেছেন। কোনো কোনো গবেষক এই দাবি করেছেন যে ধর্ম হিসেবে ইসলাম র‍্যাডিক্যাল চিন্তা এবং সহিংস উগ্রবাদী আচরণের চালক বা ড্রাইভার হিসেবে কাজ করে থাকে (সিল্ক ২০০৮)।

কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এই ধরনের বক্তব্যের পেছনে কোনো রকমের প্রমাণ নেই। মার্ক সেইজম্যান পাঁচ শ সন্ত্রাসীর ওপরে গবেষণা করে বলেছেন, তাঁর নমুনার অধিকাংশেরই ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যাপারে খুব গভীর জ্ঞান নেই, তারা ধর্মীয় পরিবার থেকেও আসেনি। তাঁর নমুনার মাত্র এক-চতুর্থাংশ ছিল গভীরভাবে ধর্মীয়, তা-ও আবার যখন তারা তরুণ ছিল। দুই-তৃতীয়াংশ ছিল কট্টর সেক্যুলার, আর বাকিরা ধর্মান্তরিত (সেইজম্যান ২০০৮)। ফেয়ার, গোল্ডস্টিন এবং হামজা পাকিস্তানের উগ্রবাদের প্রতি সমর্থন বিষয়ে গবেষণায় দেখান যে ইসলাম বিষয়ে জ্ঞান তুলনামূলকভাবে সহিংস উগ্রবাদের প্রতি কম সমর্থনের ইঙ্গিত দেয় (ফেয়ার, গোল্ডস্টিন এবং হামজা ২০১৭)।

গবেষণার এসব তথ্য যদিও এটাই প্রমাণ করে যে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে সহিংস উগ্রবাদের কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু তিনটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমত রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি সমর্থন, বিশেষ করে আত্মঘাতী বোমা হামলার সমর্থন বিষয়ে জনমত জরিপে দেখা যায়, মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রতি সমর্থন বেশি (পিউ রিসার্চ সেন্টার ২০১৪)। মুসলিমদের মধ্যে আত্মঘাতী হামলার সমর্থনের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত গবেষণায় দেখা যায়, ইসলামপন্থী রাজনীতির একটি বিশেষ ধারার প্রতি সমর্থনের সঙ্গে উগ্র সহিংসবাদের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। তবে এই সম্পর্ক জটিল, কেননা সব ধরনের ইসলামপন্থী দল বা সংগঠনই সহিংসতায় বিশ্বাস করে না। তা ছাড়া ধর্মের সঙ্গে সহিংসতার সম্পর্কের বিষয়টি এককভাবে কোনো বিশেষ ধর্মের বিষয় নয়। ছয়টি ধর্ম—ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইহুদিধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং শিখধর্ম বিষয়ে মার্ক জারগান্সমায়ার গবেষণায় এটা স্পষ্ট, যেকোনো ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক বা থিওলজিক্যাল বিষয়ের মধ্যেই সহিংসতার যৌক্তিকতা তৈরি করা যায় (জারগান্সমায়ার ২০০৩)। পৃথিবীর অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠীই ধর্মতত্ত্বের ভেতরেই তাদের সহিংসতার পক্ষে যুক্তি তৈরি করেছে। তৃতীয়ত সাম্প্রদায়িকতা বা সেক্টারিয়ানিজম অর্থাৎ নিজস্ব ধর্মীয় গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা ধর্মকে সহিংসতায় ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রদান করে। কিন্তু ধর্মের এই ব্যবহার তখনই সম্ভব হয়, যখন তা আর ব্যক্তিগত ধার্মিকতা বা ধর্মানুরাগ না থেকে হয়ে ওঠে একটি আদর্শ। র‍্যাডিক্যালাইজেশনের প্রস্তাবিত তত্ত্বগত কাঠামোর (সারণি-২) মধ্যে তা বোঝা যায়।

সারণি-২
বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের কারণ

বিভাগ	উপবিভাগ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত	অনুকূল	রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিতকরণ; নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া; র‍্যাডিক্যাল চিন্তা ও কথাবার্তার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান; অসহিষ্ণুতাকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা, ভালো-মন্দের দ্বিভাজন তৈরি; নেটওয়ার্ক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ, গোষ্ঠীগত গতিশীলতা বা ডাইনামিকসের উপস্থিতি	১৯৯১ সাল থেকে তিক্ত রাজনীতি; বিরোধী পক্ষের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা; অসহিষ্ণু আচরণের বিস্তার; বিভাজনমূলক কথাবার্তা; মূলধারার রাজনীতিতে সহিংসতা বৃদ্ধি; ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের উত্থান ও বিকাশ; ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং সেই সূত্রে র‍্যাডিক্যাল চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিতি
	অনুপ্রেরণামূলক	বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন; সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার এবং বৈষম্যের বোধ; অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বঞ্চিত হওয়া; সুযোগে সমানভাবে প্রবেশযোগ্যতা না থাকা; অন্যায্যতার শিকার হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় না থাকা; ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ক্ষোভ	দুর্বল শাসন; রাজনীতির প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট কাঠামো; চাকরিতে প্রবেশে সুযোগের অনুপস্থিতি; অর্থনৈতিক বৈষম্য; আইনশৃঙ্খলার অবনতি; সামাজিক সংহতির অভাব; বৈশ্বিকভাবে মুসলমানরা নির্যাতিত এই ধারণা

বিভাগ	উপবিভাগ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
ত্বরান্বিতকরণ /চালক		বৈশ্বিক পরিস্থিতি (যেমন ইরাক যুদ্ধ, সিরিয়া যুদ্ধ, পশ্চিমা দেশগুলোতে তাদের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি); অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি (যেমন সরকারের কঠোর নিপীড়ন, স্থানীয়ভাবে অব্যাহত সংঘাত, সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এলাকা তৈরি হওয়া); সহযোগিতার কাঠামো; সামাজিক কারণ; ব্যক্তিগত ট্রমা বা আঘাত; অতীতের কোনো অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত; অস্তিত্বজনিত উদ্বেগ (বা এক্সিস্টেনশিয়াল অ্যাংজাইটি); জীবনের গুরুত্বের অনুসন্ধান	বাইরের যোগাযোগ, বিশেষ করে সহিংস উগ্রবাদীদের সঙ্গে; আফগানিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ; জেএমবির উত্থান; সরকারের পরোক্ষ অনুমোদন
আদর্শিক		কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক আদর্শ; সমাজের জন্য কী ভালো, সে বিষয়ে এমন বিশ্বাস, যা নিয়ে বিতর্ক করা যাবে না; ধর্ম বা বিশ্ববীক্ষার একটিমাত্র ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা; নৈতিক বা আচরণের ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকে মান বা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে গ্রহণ করা।	সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের ব্যাপক প্রসার; ইসলামকে একটি প্রধান জায়গায় স্থাপন করা; রাষ্ট্রধর্মের সাংবিধানিক ব্যবস্থা; ইসলামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে সখ্য; রক্ষণশীল এবং আক্ষরিক ব্যাখ্যাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া

বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদ বিস্তারের কারণ ও প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে দুই দশক ধরে চলা বেসামরিক এবং সামরিক কর্তৃত্ববাদের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রায়ণের সূচনা হয় ১৯৯১ সালে। কিন্তু শুরু থেকেই প্রধান দুই দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মধ্যে এক তিক্ত রাজনীতির সূচনা হয় (রীয়াজ ২০১৬ঙ)। যদিও ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমেই, কিন্তু দুই প্রধান দলই যখনই পরাজিত হয়েছে, তখনই নির্বাচনের সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে (সেফার ২০০২)। তারা ক্ষমতায় থাকার সময় নির্বাচন কমিশনের মতো জরুরি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগ নেয়নি। দলের ভেতরে গণতন্ত্রচর্চায় উৎসাহ দেখায়নি (এমুন্ডসেন ২০১৬)। এসবের পাশাপাশি প্রশাসনের দলীয়করণ (হাসান ২০১৬) এবং প্রতিপক্ষের রাজনীতি করার বৈধতার প্রশ্ন তুলেছে। এগুলো দেশে একধরনের বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তৈরি করা বিভক্তি এবং উগ্র কথাবার্তার পাশাপাশি মূলধারার রাজনীতিতে সহিংসতা বেড়েছে, দলগুলো তাকে উৎসাহিত করেছে (পারভেজ ২০১৯)। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতিপক্ষকে দমন এবং বিরোধী মতকে নিস্তব্ধ করার জন্য। ক্ষমতাসীন দল এমন সব দলের সঙ্গে সখ্য গড়েছে, যারা প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদদের শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা এবং নন-স্টেট অ্যাক্টররা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতায় যুক্ত হয়েছে এবং দায়মুক্তি ভোগ করেছে। ভিন্নমত দমনের জন্য আইন তৈরি এবং তার প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলো চিন্তার ক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যালাইজেশনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং তা কেবল ধর্মভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ঘটেনি। যাকে আমরা আগের আলোচনায় র‍্যাডিক্যালিজমের কগনিটিভ বা জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক বলে বর্ণনা করেছি। এই কগনিটিভ র‍্যাডিক্যালাইজেশন কেবল যে ইসলামপন্থীদের মধ্যেই উপস্থিত থাকবে তা নয়, বরং সমাজের এক বড় অংশকেই প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একটি ইলেকটোরাল ডেমোক্রেসি বা নির্বাচনী গণতন্ত্র থেকে হাইব্রিড রেজিম বা দো-আঁশলা ব্যবস্থার দিকে গেছে (রীয়াজ ২০১৯)। কেবল যে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার অনুপস্থিতিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা নয়, সহিংসতার সঙ্গে যুক্তদের দায়মুক্তি ততই সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। দেশে অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এই অসহিষ্ণুতা একাদিক্রমে ধর্মের প্রশ্নে এবং জাতীয়তাবাদের নামেই প্রচার করা হয়েছে। রাষ্ট্র এবং ক্ষমতাসীনেরা যতই বলেছেন, ইসলামের অবমাননা সহ্য করা হবে না (২৪নিউজপেপারলাইভ ২০১৬; বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ২০১৮), ততই ধর্মভিত্তিক অসহিষ্ণু উগ্রবাদের পথ সুগম হয়েছে।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের যে ধারা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকেই চূড়ান্ত বলে মনে করে এবং তাকেই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করেছে, তা-ও একইভাবে

উগ্রবাদিতার পথ উন্মুক্ত করেছে। আমরা কেবল কগনিটিভ পরিবর্তনই প্রত্যক্ষ করিনি, রাজনীতিতে সহিংসতার মাত্রাও বেড়েছে। ২০০৬ সালের ঘোষিত নির্বাচনের (অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে) আগে আওয়ামী লীগ কর্মীদের আচরণ, লিবারেল বলে পরিচিত ব্লগার ও লেখকদের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থী সহিংস উগ্রবাদীদের হামলা ও হত্যার ঘটনা, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর সহিংস প্রতিবাদ এবং ২০১৪ সালের আগে ও ২০১৫ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের বর্ষপূর্তিতে বিএনপির আন্দোলন এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের নিপীড়ন একধরনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। ২০১৩ সালে গণজাগরণ মঞ্চ এবং হেফাজতে ইসলামের পরস্পরবিরোধী যেসব কথাবার্তা, তাতেই সমাজে র‍্যাডিক্যালাইজেশনের মাত্রা এবং গ্রহণযোগ্যতা বোঝা যায়।

গত কয়েক দশকে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিশেষ করে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং স্বল্প মূল্যে মোবাইল ফোন পাওয়ার সুযোগ অনেকের জন্যই অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে এর প্রভাব পড়েছে র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীগুলোর প্রচার ও প্রসারের কাজে; তারা সহজেই তাদের বক্তব্য ছড়িয়ে দিতে পারছে। আন্তর্জাতিক সহিংস উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের সদস্য সংগ্রহ করে থাকে। আওয়ান (২০০৭), ও'রুক (২০০৭), টাকার (২০১০) এবং বেয়ার ও অন্যান্য (২০১৩) তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, ইন্টারনেট র‍্যাডিক্যালাইজেশনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সহিংস ইসলামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে ইন্টারনেটকে বলা হয়েছে চালক (বার্ডওয়েল ও ব্রিগস ২০০৯)। ইন্টারনেটকে ত্বরান্বিতের উপাদান (পানটুচি ২০১১) এবং 'একো চেম্বার' (সাদিক ২০১১) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উগ্রবাদের প্রচারে ইন্টারনেটের ব্যবহার নিয়ে গবেষণায় গোড়াতে ইসলামপন্থীদের দিকে নজর দিলেও সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো হয়েছে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের নিয়ে; তাতে দেখা যায় এই গোষ্ঠীগুলো আদর্শিক প্রচার ও সদস্য সংগ্রহের কাজে ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার করে থাকে (*নিউইয়র্ক টাইমস* ২০১৮; কোহলার ২০১৪)।

বাংলাদেশে উপস্থিত সহিংস উগ্রবাদীদের ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয় ২০১৬ সালে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার পরে। ওই হামলার সময় আইএসের ওয়েবসাইটে রিয়েল টাইমে তার ছবি প্রচার করা হয়। বাংলাদেশে ইসলামপন্থী সহিংসতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৫০ জন সন্ত্রাসীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, তাদের উগ্র ভাবধারা গ্রহণের পেছনে যে চারটি কারণ কাজ করেছে, ইন্টারনেট তার একটি (রীয়াজ ও পারভেজ ২০১৮)। পারভেজ (২০১৭) সালে এক গবেষণায় দেখান যে সহিংস উগ্রবাদীরা প্রচার, অর্থ সংগ্রহ এবং সদস্য সংগ্রহের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশের

পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ২০১৭ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে আটক সহিংস উগ্রবাদীদের ৮২ শতাংশ র‍্যাডিক্যাল আদর্শে উজ্জীবিত হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত প্রচারসামগ্রী বা প্রোপাগান্ডা দিয়ে (কোরায়া ২০১৭)।

বাংলাদেশে র‍্যাডিক্যালাইজেশনের যেসব অনুপ্রেরণামূলক কারণ দেখা যায়, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ও প্রান্তিকতার বোধ। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও সমাজে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে। দুর্বল শাসন, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে উপস্থিত প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট কাঠামো বিরাজমান ব্যবস্থার ব্যাপারে একধরনের ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের আদর্শের প্রতি আগ্রহী করে। এই ধরনের চিন্তা র‍্যাডিক্যালাইজেশনের জন্য কগনিটিভ দিকটি তৈরি করে। অতীতে বাংলাদেশে মূলধারার রাজনীতিতে বামপন্থী সংগঠনগুলোর শক্তিশালী অবস্থানের কারণে এই ধরনের ক্ষোভ ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সেই দলগুলো ধারণ করত। কিন্তু তাদের দুর্বলতার কারণে ইসলামপন্থী দলগুলো আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। বৈশ্বিকভাবে মুসলমানরা নির্যাতিত বলে মনে করা মানসিকভাবে উগ্রপন্থার দিকে আকর্ষণ করে থাকে।

যেসব বিষয় উগ্রবাদ ত্বরান্বিতকরণের কাজে অবদান রাখে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং ট্রমা (বা মানসিক আঘাত)। ১৫০ জন উগ্রবাদীর ওপর চালানো গবেষণায় দেখা যায়, যারা সহিংসতায় যুক্ত ছিল, তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন ধরনের মানসিক আঘাত এবং ক্ষতির (যেমন নিকটজনের মৃত্যু) সম্মুখীন হয়েছে (রীয়াজ ও পারভেজ ২০১৮)। আরেকটি বিষয় হচ্ছে সহযোগিতার কাঠামো থাকা—ইসলামপন্থী দলগুলোর ক্ষেত্রে আফগানিস্তানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, দেশে হুজির উত্থান, ইরাকে আইএসের উত্থান এ ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের ক্ষেত্রে কাজ করেছে।

র‍্যাডিক্যালাইজেশনের একটি উপাদান হয়ে উঠতে পারে মতাদর্শ। যেকোনো মতাদর্শ মানুষকে একটি বিশ্ববীক্ষা উপহার দেয়। কিন্তু একটি মতাদর্শ যখন ইতিহাসের একটি ব্যাখ্যাকেই চূড়ান্ত এবং এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচনা করে, তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহী করে এবং অন্যের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন তা হয়ে ওঠে উগ্রবাদিতার উপকরণ। এই মতাদর্শ—ধর্ম, জাতীয়তাবাদ বা বামপন্থা থেকে উদ্ভূত হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একাদিক্রমে ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদের একটি ব্যাখ্যা একধরনের বাইনারি বা দ্বিধাবিভক্তি টেনেছে—এই দুই আদর্শের অনুসারীরাই তাঁদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারীদের 'শত্রু' বলে গণ্য করার একটি মানসিকতা গ্রহণ করেছে, যা শুধু কগনিটিভ র‍্যাডিক্যালাইজেশনই ঘটায় না, সহিংসতার দিকেই ঠেলে দেয়।

উপসংহার

বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদের কারণ এবং পথরেখা অনুসন্ধানের জন্য কেবল বর্ণনামূলক গবেষণা যথেষ্ট নয়।

সহিংস উগ্রবাদের কারণ এবং পথরেখা অনুসন্ধানের জন্য র‍্যাডিক্যালাইজেশনের বুদ্ধিবৃত্তিক বা মানসিক (কগনিটিভ) এবং আচরণগত (বিহেভিয়ারাল) উভয় দিকই বিবেচনা করা দরকার। সহিংস আচরণের জন্য যেকোনো ব্যক্তির মানসিক বা কগনিটিভ পরিবর্তন জরুরি, কিন্তু কগনিটিভ পরিবর্তনই সহিংস আচরণ করতে প্ররোচিত করে না। এই আলোচনায় দেখিয়েছি, র‍্যাডিক্যালাইজেশনের কোনো একক বা নির্দিষ্ট কারণগুচ্ছ নেই এবং এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয়। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরনের উপাদান রয়েছে এবং এগুলোর সন্নিবেশই সহিংস উগ্রবাদের বিকাশ ঘটায়।

এ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, চালক, আদর্শিক—এই তিন উপাদানের সমন্বয়েই সহিংস উগ্রবাদী মানসিকতা ও আচরণ তৈরি করেছে। বাংলাদেশে উগ্রবাদের কারণ বিস্তারে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিশেষত রাজনৈতিক অবস্থা একটি উপাদান হিসেবে কাজ করছে। তিক্ত রাজনীতি এবং বিভক্তির আদর্শ এমন এক অবস্থার সূচনা করেছে, যেখানে ধর্মভিত্তিক এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিভিন্নভাবেই উগ্রবাদী অবস্থান ও চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ইসলামপন্থী সহিংস উগ্রবাদী সংগঠনগুলোর বিকাশে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। সমাজে ও রাজনীতিতে ইসলামপন্থীদের শক্তির বিকাশ, সরকারের আনুকূল্য এবং ইসলামপন্থী সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি এ ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছে।

তথ্যসূত্র

Amundsen, Inge. 2016. 'Democratic Dynasties? Internal Party Democracy in Bangladesh.' *Party Politics* 22 (1): 49-58. https://doi.org/10.1177/1354068813511378.

Awan, Akil N. 2007. 'Radicalization on the Internet?: The Virtual Propagation of Jihadist Media and Its Effects.' *The RUSI Journal* 152 (3): 76-81. https://doi.org/10.1080/03071840701472331.

Behr, Ines von, Anais Reding, Charlie Edwards, and Luke Gribbon. 2013. 'Radicalisation in the Digital Era: The Use of the Internet in 15 Cases of Terrorism and Extremism.' Rand Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR453.html.

Birdwell, Jonathan, and Rachel Briggs. 2009. 'Radicalisation among Muslims in the UK.' MICROCON Policy Working Paper 7. Brighton: MICROCON. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.642.7228&rep=rep1&type=pdf.

Borum, Randy. 2011, 'Radicalization into Violent Extremism II : A Review of Conceptual Models and Empirical Research.' *Journal of Strategic Security*, 4 (4), Winter, pp. 37-62.

Corraya, Sumon. 2017. 'About 82 per Cent of Militants Radicalised on Social Media in Bangladesh,' March 23, 2017. http ://www.asianews.it/news-en/About-82-per-cent-of-militants-radicalised-on-social-media-in-Bangladesh-40277.html

Crenshaw, Martha. 1981. 'The Causes of Terrorism.' *Comparative Politics* 13 (4) : 379-99. https ://doi.org/10.2307/421717.

Fair, C. Christine, Ali Hamza, and Rebecca Heller. 2017. 'Who Supports Suicide Terrorism in Bangladesh? What the Data Say.' *Politics and Religion* 10 (3) : 622-61. https ://doi.org/10.1017/S1755048317000347.

Fair, C. Christine, Jacob S. Goldstein, and Ali Hamza. 2017. 'Can Knowledge of Islam Explain Lack of Support for Terrorism? Evidence from Pakistan.' *Studies in Conflict & Terrorism* 40 (4) : 339-55. https ://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1197692.

Francis, Matthew. 2012. 'What Causes Radicalisation? Main Lines of Consensus in Recent Research.' Radicalisation Research. January 24, 2012. https ://www.radicalisationresearch.org/guides/francis-2012-causes-2/.

Hafez, Mohammed, and Creighton Mullins. 2015. 'The Radicalization Puzzle : A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism.' *Studies in Conflict & Terrorism* 38 (11) : 958-75. https ://doi.org/10.1080/1057610X.2015.1051375.

Hassan, Mirza. 2013. 'Political Settlement Dynamics in a Limited-Access Order : The Case of Bangladesh.' esid-023-13. *Global Development Institute Working Paper Series*. Global Development Institute Working Paper Series. GDI, The University of Manchester. https ://ideas.repec.org/p/bwp/bwppap/esid-023-13.html.

Juergensmeyer, Mark. 2003. *Terror in the Mind of God : The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley : University of California Press.

Koehler, Daniel. 2014. 'The Radical Online : Individual Radicalization Processes and the Role of the Internet.' *Journal for Deradicalization* 0 (1) : 116-34.

O'Rourke, Simon. 2007. 'Virtual Radicalisation : Challenges for Police.' In *School of Computer and Information Science, Edith Cowan University*. https ://doi.org/10.4225/75/57a83c57befa.

Pantucci, Raffaello. 2011. 'A Typology of Lone Wolves : Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists.' Development in Radicalization and Political Violence. The International Center for the Study of Radicalization and Political Violence (ICSR)). https ://icsr.info/wp-content/uploads/2011/04/1302002992ICSRPaper_

ATypologyofLoneWolves_Pantucci.pdf.

Parvez, Saimum. 2017. 'Internet and Radicalization in Bangladesh, Democracy and Governance.' Contemporary Issues in Bangladesh. Dhaka : Public Policy & Governance Program, North South University.

Parvez, Saimum. 2019. 'Explaining political violence in contemporary Bangladesh (2001-2017)' in Ali Riaz, Zobaida Nasreen and Fahmida Zaman (eds). Political Violence in South Asia, London : Routledge.

Riaz, Ali & Saimum Parvez. 2018. 'Bangladeshi Militants : What Do We Know?,' *Terrorism and Political Violence*, 30 :6, 944-961, DOI : 10.1080/09546553.2018.1481312

Riaz, Ali. 2006. *Unfolding State : The Transformation of Bangladesh*. Ontario, CA : deSitters Publishers

Riaz, Ali. 2008. *Islamist Militancy in Bangladesh : A Complex Web*, London : Routledge.

Riaz, Ali. 2016. 'Who are the Bangladeshi 'Islamist Militants'?' *Perspectives on Terrorism*, 10 : 1. http ://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/485/html

Riaz, Ali. 2016ঙ. *Bangladesh : A Political History since Independence*. London.

Riaz, Ali. 2019. *Voting in a Hybrid Regime : Explaining the 2018 Bangladeshi Election*. Singapore : Palgrave MacMillan.

Saddiq, Mohamed Abdul. 2011. 'Whither E-Jihad : Evaluating the Threat of Internet Radicalisation.' In *Strategic Currents*, edited by Yang Razali Kassim, 137-39. Singapore : ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore. https ://doi.org/10.1355/9789814345491-043.

Sageman, Marc. 2004. *Understanding Terror Networks*. Philadelphia : University of Pennsylvania Press.

Schmid, Alex. 2004. 'Terrorism - The Definitional Problem,' *36 Case W. Res. J. Int'l L. 375*; 2004; Available at : http ://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol36/iss2/8 (accessed 26 December 2017).

Schmid, Alex. 2013. 'Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation : A Conceptual Discussion and Literature Review,' March. https ://icct.nl/publication/radicalisation-de-radicalisation-counter-radicalisation-a-conceptual-discussion-and-literature-review/.

Silke, Andrew. 2008. 'Holy Warriors : Exploring the Psychological Processes of Jihadi Radicalization.' *European Journal of Criminology* 5 (1) : 99-123. https ://doi.org/10.1177/1477370807084226.

Simon, Jeffrey D. 1994. *The Terrorist Trap.* (Bloomington : Indiana University Press, 1994).

The New York Times, 2018. 'The New Radicalization of the Internet.' Editorial Board, *The New York Times*, November 24, 2018, sec. Opinion. https ://www.nytimes.com/2018/11/24/opinion/sunday/facebook-twitter-terrorism-extremism.html.

Tucker, David. 2010. 'Jihad Dramatically Transformed? Sageman on Jihad and the Internet.' *Homeland Security Affairs* 6 (1) : 1-7.

USAID, 2009. 'Guide to Drivers of Violent Extremism.' Washington D.C. : USAID,

Weinberg, Leonard, Ami Pedahzur and Sivan Hirsch-Hoefler. 2004. 'The Challenges of Conceptualizing Terrorism,' *Terrorism and Political Violence*, 16(4), 2004, pp. 777-794.

বিডিনিউজ২৪, ২০১৮ 'ইসলামের অবমাননা করার অধিকার কারও নেই : প্রধানমন্ত্রী', ১১ জুলাই ২০১৮ https ://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1517446.bdnews

রীয়াজ, আলী ২০১৫ক, 'আইএস না থাকলেও জঙ্গি আছে', *প্রথম আলো*, ৪ অক্টোবর ২০১৫

রীয়াজ, আলী ২০১৫খ, দেশীয় জঙ্গিদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, *প্রথম আলো*, ৫ অক্টোবর ২০১৫

রীয়াজ, আলী ২০১৬ক, 'কেউ রাতারাতি জঙ্গি হয়ে ওঠে না', *প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট ২০১৬

রীয়াজ, আলী ২০১৬খ, 'যেসব কারণে কেউ জঙ্গি হয়', *প্রথম আলো*, ১০ আগস্ট ২০১৬

রীয়াজ, আলী ২০১৬গ, 'শুধু ধর্মের মধ্যে সমস্যা খোঁজা নয়', *প্রথম আলো*, ১১ আগস্ট ২০১৬

রীয়াজ, আলী ২০১৬ঘ, 'জঙ্গি হয়ে ওঠার পর্যায় ও পটভূমি,' *প্রথম আলো*, ১২ আগস্ট ২০১৬

রীয়াজ, আলী, ২০১৭ক, 'আইএস কীভাবে রাষ্ট্র ঘোষণা করল;, *প্রথম আলো*, ২৮ জুলাই ২০১৭

রীয়াজ, আলী ২০১৭খ, 'আইএসের সমান্তরালে আল-কায়েদার শক্তি সঞ্চয়', *প্রথম আলো*, ২৯ জুলাই ২০১৭

রীয়াজ আলী ২০১৭গ, 'উপমহাদেশে আল-কায়েদার নজর', *প্রথম আলো*, ৩০ জুলাই ২০১৭

রীয়াজ, আলী ২০১৭ঘ, 'বাংলাদেশ নিয়ে ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে', *প্রথম আলো*, ৩১ জুলাই ২০১৭

হোসেন, আকবর ২০১৯ 'যেভাবে চরমপন্থায় রূপ নিল বাংলাদেশের উগ্র বাম আন্দোলন', *বিবিসি বাংলা*, ৯ এপ্রিল ২০১৯, https ://www.bbc.com/bengali/news-47868773

সুলতান, টিপু ২০১৬, 'চরম নৃশংসতা নিয়ে হাজির হয়েছে "আইএস" মতাদর্শীরা', *প্রথম আলো*, ২ নভেম্বর ২০১৬

২৪নিউজপেপারলাইভ ২০১৬, প্রধানমন্ত্রী : ইসলাম ধর্মের অবমাননা বরদাশত করা হবে না, ১৩ জুলাই ২০১৬ https ://www.bangla.24livenewspaper.com/bangladesh/7696-pm-will-not-tolerate-insulting-islam

আন্তর্জাতিক

গ্যারিসন রাষ্ট্র এবং গণহত্যা : রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সহিংসতা

নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ

মিয়ানমারে সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্রের পথে উত্তরণে এই দেশটির শেষ কয়েক বছরের প্রচেষ্টা আপাতব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মিয়ানমার রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর (তাতমাদো) ভূমিকা নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এই প্রবন্ধে ল্যাসওয়েলের (১৯৪১) গ্যারিসন রাষ্ট্রের ধারণার ওপর ভিত্তি করে মিয়ানমারের রাজনৈতিক কাঠামো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাষ্ট্রকাঠামোর সামরিকায়নের অংশ হিসেবে বেসামরিক নাগরিক, রাজনৈতিক দল এবং সিভিল সোসাইটি তাতমাদোর সহায়ক শক্তি হতে বাধ্য হয়েছে। এ বিষয়টিকে গ্যারিসন সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই রাষ্ট্র নিজের গ্যারিসন সংস্কৃতিকে আরও গভীরে প্রোথিত করার জন্য বিভাজনের রাজনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। নিরাপত্তার সংকট তৈরি করা এই রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এভাবে রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের ওপর জাতিগত নিধন বা গণহত্যা পরিচালনা করা হয়েছে। আরও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর ওপর এই বিভাজনের রাজনীতি আর নির্যাতন চালানো হয়েছে। মিয়ানমারে তাতমাদো তার গোষ্ঠীস্বার্থ কায়েমের লক্ষ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবন নাশ করতে পিছপা হয়নি। সামরিক অভ্যুত্থানের পর এই সহিংসতা এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সর্বস্তরে সামরিকায়ন ঘটানো গ্যারিসন রাষ্ট্রের এটি একটি অবধারিত পরিণতি। এই ধরনের রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সহিংসতা ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের কেন্দ্রীভূত অবস্থানকে স্থায়ী করে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

মিয়ানমার, গ্যারিসন রাষ্ট্র, রোহিঙ্গা, সহিংসতা, গণহত্যা, রাজনীতি

ভূমিকা

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী (তাতমাদো) রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতা জোরপূর্বক দখলে নিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বহুদিন ধরে চলা সামরিক

অভ্যুত্থানের গুজবের অবসান হলো। এবারে সামরিক বাহিনী যে অভিযোগগুলোর প্রসঙ্গ তুলে তাদের ক্ষমতা দখলকে জায়েজ করার চেষ্টা করেছে, তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তাতমাদো এবং এদের কিছু পছন্দের গোষ্ঠী ২০২০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বেসামরিক রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রতি ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনে। এই অভিযোগের মীমাংসা করার লক্ষ্যে এবং 'প্রকৃত গণতন্ত্র' ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাতমাদোর প্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের নেতৃত্বে ২০২১ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি অং সান সু চির সরকারকে উৎখাত করা হয়। এদিন নতুন পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার দিন ধার্য ছিল। তবে সেদিন সু চিসহ নির্বাচিত অনেক বেসামরিক নেতাকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে এই অভ্যুত্থানকে কার্যকর করা শুরু হয়।

মিয়ানমারের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা নতুন নয়। তবে বিশ্ব গণমাধ্যম ও সামাজিক গণমাধ্যমের কল্যাণে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ অনেকের নজরে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মিয়ানমারের তাতমাদো কর্তৃক গণহত্যা ও সহিংসতার শিকার বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জোরপূর্বক বাংলাদেশে আশ্রয়লাভ ও তাদের দুঃখ-দুর্দশা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মিয়ানমার রাষ্ট্রকে অনেকের কাছেই নতুন করে গবেষণার বিষয়বস্তু করে তুলেছে। এ ছাড়া সামরিক অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের একটি অংশের অভূতপূর্ব আন্দোলন ও বিক্ষোভ এবারের সামরিকায়নের পথকে কতখানি দীর্ঘায়িত করে, তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ২৮ মার্চ, শনিবার, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দিবসে, এক দিনে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলায় প্রায় এক শ জনকে হত্যা করা হয়েছে। দুই মাসের কম সময়ে চলা এই বিক্ষোভে কয়েক শ মানুষ সামরিক জান্তার হাতে নিহত হয়েছে। ক্ষমতায় থাকার নিমিত্তে গণহত্যা ও সহিংসতা এবং মিয়ানমারের রাজনৈতিক সামরিকায়নের সংযোগের চিত্র তাই এখন অনেকখানি উন্মোচিত।

১৯৬২ সাল থেকে আজ অবধি মিয়ানমারের রাজনীতিতে তাতমাদোর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ একটি অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আর এই ক্ষমতায় আরোহণের লক্ষ্যে গণহত্যা পরিচালনা, বিচ্ছিন্নতাবাদে মদদ দেওয়া এবং তা সহিংস প্রক্রিয়ায় দমন করা এবং রাষ্ট্রের জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার মধ্য দিয়ে তাদের বাস্তুচ্যুত করার মতো কাজ তাতমাদো করে এসেছে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে। এই রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল ধরে রাজনীতি, অর্থনীতি ও বেসামরিক অন্যান্য ক্ষেত্রে সামরিকায়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ রাষ্ট্রের প্রকৃতি কেমন এবং এখানে তাতমাদো বা সামরিক গোষ্ঠীর আচরণ এমন কেন, তা-ই এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে দেখা যায়। 'গ্যারিসন' রাষ্ট্রের ধারণা এবং এর আবর্তে মিয়ানমার রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বর্তমানের সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে ২০১৭ সালের আগে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর

ওপর সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, জাতিগত সহিংসতা ও জোরপূর্বক তাদের বাস্তুচ্যুত করে দেশত্যাগে বাধ্য করার ঘটনাগুলোর কাঠামোগত যোগসূত্র রয়েছে। আশির দশক থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্বের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই সহিংসতার সূত্রপাত। তাতমাদো রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে রোহিঙ্গাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং সবশেষে গণহত্যা পরিচালনার মধ্য দিয়ে তাদের নিধন ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের এক জঘন্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছে। ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার এই প্রান্তিক জনগণের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এবং এশিয়ার অন্য কিছু দেশে শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করছে। রোহিঙ্গাদের ওপর পরিচালিত গণহত্যা ও সহিংস নির্যাতন মিয়ানমার রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিচায়ক।

গণহত্যা বা জাতিগত নিধন এই শব্দদ্বয় অনেক সময় সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৫১ সালে গৃহীত জাতিসংঘের গণহত্যা প্রতিরোধ কনভেনশনের সংজ্ঞা অনুসারে বলা হয়, জাতীয়তা, জাতিগত পরিচয়, বর্ণ ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে একটি গোষ্ঠীকে 'পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার ইচ্ছায়' সংঘটিত হত্যাই গণহত্যা (United Nations, 1948)। জাতিগত নিধন সে ক্ষেত্রে গণহত্যার একটি ধরন হতে পারে। পোলিশ আইনবিশারদ রাফায়েল লেমকিনের মতে, একটি গণহত্যার ঘটনায় কতজন লোককে নিধন করা হয়েছে বা কী পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, তার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচার মুখ্য বিবেচ্য নয়। অপরাধকারী তা সে রাষ্ট্র বা অন্যান্য গোষ্ঠী যে-ই হোক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ (Moses, 2010)। পুরোপুরি বা আংশিকভাবে রোহিঙ্গা নিধনের ক্ষেত্রে মিয়ানমারের তাতমাদোর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং গ্যারিসন রাষ্ট্রধারণাকে আরও সুসংহত করার ক্ষেত্রে তা সামরিক জান্তাকে একধরনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

উপরিউক্ত ধারণাগুলো বিবেচনায় রেখে এই প্রবন্ধে মিয়ানমার রাষ্ট্রের সঙ্গে তাতমাদোর সম্পর্ক এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের চালচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। এই যোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্যারিসন রাষ্ট্রের ধারণার সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। যদিও কিছুকাল আগে মিয়ানমারে গণতন্ত্রের সুবাতাস বয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক বিশ্লেষককে আশাবাদী হতে দেখা গেছে। কিন্তু তাঁরা বোধ করি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে গ্যারিসন রাষ্ট্র মিয়ানমারে রাজনৈতিক সামরিকায়নের ধারা সর্বদাই বিরাজমান ছিল। একটি বা দুটি নির্বাচনে বেসামরিক রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আরোহণের মধ্য দিয়ে এই সামরিকায়নের প্রভাব কাটানো সম্ভব হয়নি। রোহিঙ্গা নিধন ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করে তাদের দেশছাড়া করার পেছনে বেসামরিক রাজনীতির প্রচ্ছন্ন সমর্থন—এই সবকিছুই সামরিক জান্তার ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থানকে আরও প্রশস্ত করেছে। এই প্রবন্ধের আলোচনায় তাই ফুটে উঠেছে

তাতমাদো কীভাবে জাতিগত সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে তুলে ধরেছে এবং লাগামহীনভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে কাজ করছে। এখানে বেসামরিক জনগণ ও সিভিল সোসাইটি এবং মিয়ানমারের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো তাতমাদোর সমর্থনে মানবতাবিরোধী অপরাধে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে গেছে। গ্যারিসন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মিয়ানমারের তাতমাদো ও তাদের অনুসারী বেসামরিক কর্তৃপক্ষের এই আচরণ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থকে একক সত্তায় পরিণত করে। এতে করে সামরিক অভ্যুত্থান ও জাতিগত নিধন একে অপরের পরিপূরক কার্যক্রম হিসেবে সামরিক এলিটদের অবধারিত বিষয়ে পরিণত হয়।

গ্যারিসন রাষ্ট্রের ধারণা ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণহত্যার পথে মিয়ানমার

হ্যারল্ড ডি ল্যাসওয়েল গ্যারিসন রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাপকভাবে খতিয়ে দেখেছেন। ল্যাসওয়েলের (১৯৪১) মতে, গ্যারিসন রাষ্ট্র বলতে এমন এক রাষ্ট্রকে বোঝায়, যে রাষ্ট্র সব সময় নিজের 'অস্তিত্বের' প্রতি নির্মিত হুমকির ব্যাপারে অপ্রতিরোধ্য তাড়না নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। এর ফলে অনেক সময় বিষয়টি অতিমাত্রার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নেতিবাচক সব বৈশিষ্ট্যসহ কাল্পনিক উদ্বেগে পরিণত হয়। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ধরনের রাষ্ট্রে সব ধরনের হুমকি থেকে দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীই হলো আদর্শ নেতা এবং অগ্রগামী শক্তি—এই ধারণার ওপর জোর দেওয়া হয়। উর্দি পরিহিত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী, যারা সমাজের সব স্তরেই গভীরভাবে বিরাজমান। এর ফলে সামাজিক মূল্যবোধে সামরিক ধারণা ও মূল্যবোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে গেঁথে যায় (Ahmed, 2013)। গ্যারিসন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ হয়ে ওঠে সমরবাদ (মিলিটারিজম), যেখানে যুদ্ধ এবং এ-বিষয়ক পরিকল্পনাকে সমাজের রীতিনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Mann, 1988)। গ্যারিসন রাষ্ট্র প্রায়ই স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলে: প্রথমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান মাঝেমধ্যে বেসামরিক পক্ষ নিতে পারে; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র চালাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শক্তিশালী নেতৃত্বসহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনী থাকে। ফ্যাসিবাদী প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে গ্যারিসন রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবেই সহিংসতার বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হয়ে থাকে। এর ফলে সহিংসতা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষমতা বাস্তবায়নে সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী হলো তাতমাদো (Mann, 1988)। যেহেতু গ্যারিসন রাষ্ট্রের এসব প্রবণতা কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় না, তাই ধীরে ধীরে সমাজের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রে বেসামরিক পরিসর যদি থেকেও থাকে, তাহলে তা সামরিক সংস্থাগুলোর জোরালো আধিপত্যের অধীনে তৈরি হয়ে থাকে।

সে জন্য ধারণাগতভাবে গ্যারিসন রাষ্ট্রের সঙ্গে বেসামরিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধাত্মক সম্পর্ক। স্ট্যানলি ও সেগাল (1989 : 83) গ্যারিসন রাষ্ট্রের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> গ্যারিসন রাষ্ট্রে প্রযুক্তিগতভাবে পরিশীলিত সামরিক কর্মকর্তাদের প্রয়োজন পড়ে, যেমন 'সহিংসতায় সিদ্ধহস্ত ব্যক্তিবর্গ', যেন সমাজের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যায়। কয়েকজন ব্যক্তির হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। কর্তৃত্ব ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবহমান হয় এবং বেসামরিক রাজনীতিবিদ এবং গণতান্ত্রিক ঝোঁকসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে অক্ষম করে ফেলা হয়।

এ ছাড়া এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে গ্যারিসন রাষ্ট্র দুটি পদ্ধতিতে সহিংসতার ওপর নিজের একাধিপত্যকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে থাকে। প্রথমত, 'এমনভাবে সামাজিকীকরণ করা হয় যেন পরবর্তী প্রজন্মগুলো সমাজের সামরিক মডেল গ্রহণ করে; এবং দ্বিতীয়ত, সামরিক বাহিনীকে "বেসামরিকীকরণ" করার ক্ষেত্রে বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অক্ষমতা থাকে' (Stanley and Segal, 1989 : 85)। সে জন্য গ্যারিসন রাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তার সংস্কৃতি গ্রহণ করে, যেখানে রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সম্ভাব্য হুমকি অনুভব করে এবং সে কারণে শুধু জাতীয় নিরাপত্তার মডেলকেই (যেমন সামরিক বাহিনী বা তাতমাদো) এই সংকটের সমাধান হিসেবে ভাবা হয়। বহুদিন এই চর্চা চলার কারণে মনে হবে, সমাজব্যবস্থা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ না করে বরং নিজেই তা আত্মস্থ করে ফেলে। তখন জাতীয় নিরাপত্তা এবং কাল্পনিকভাবে নির্মিত হুমকি হয়ে ওঠে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান উদ্বেগের বিষয় (Paul, 2014)।

সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক বিষয়ে অন্যতম বিশেষজ্ঞ স্যামুয়েল পি হান্টিংটন (১৯৫৭)। তিনি বেসামরিক এবং গ্যারিসন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সহজ দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে যে যুক্তি, তার বিপরীত যুক্তি দিয়েছেন। ল্যাসওয়েলের বিপরীতে তিনি এই দ্বৈত পদ্ধতিকে অতি সাধারণীকরণ হিসেবে দেখেন এবং বলেন যে এর মাধ্যমে আধুনিক সামরিক-কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রের জটিলতাগুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। হান্টিংটনের মতে, এটি নির্ভর করে নির্দিষ্ট মডেলের ওপর। গণতান্ত্রিক এবং সামরিক যেকোনো শাসনই আসতে পারে, আবার চলেও যেতে পারে। এই দুটি মডেলেই একটি অন্যটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যেকোনো মাত্রায় জড়িত থাকতে পারে। এটি নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটের ওপর (Huntington, 1957)।

টিভি পল (২০১৪), *দ্য ওয়ারিওর স্টেট অন পাকিস্তান* গ্রন্থে গ্যারিসন রাষ্ট্রের ধারণা বিস্তৃত করেছেন। সেখানে তিনি এ ধরনের রাষ্ট্রে বেসামরিক রাজনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। তাঁর যুক্তি হলো, গ্যারিসন রাষ্ট্র 'মাঝেমধ্যে বেসামরিকদের কিছু ক্ষমতা দিতে পারে, বিশেষ করে যখন সামরিক বাহিনী জনগণকে

পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা বা পাবলিক গুডস দিতে পারে না' (Paul, 2014 : 72)। তবে খুব কম সময়ের মধ্যে দেখা যায় সামরিক বাহিনী নিজ ক্ষমতা আবারও জারি করে এবং রাষ্ট্রে বেসামরিক সরকারের ক্ষমতা ছাপিয়ে যায় বা দমন করে (Paul, 2014)। মিয়ানমারের প্রেক্ষাপটে এই বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকখানি প্রতীয়মান হয়। সে জন্য মিয়ানমার রাষ্ট্রের বিবর্তন এবং কীভাবে সামরিক বাহিনী এই বিবর্তনের এবং সমসাময়িক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল, তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

মিয়ানমারে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণহত্যার কর্মসূচি পরিচালনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা চালানোর ক্ষেত্রে গ্যারিসন রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষমতা সংহত করা হয়েছে। তাই এই ধরনের রাষ্ট্রের ভূমিকা বোঝার জন্য এই প্রবন্ধে মিয়ানমারকে একটি একক ক্রিটিক্যাল কেস হিসেবে দেখা হয়েছে। জেনারেল নে উইন ১৯৬২ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রায় পাঁচ দশক ধরে ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছে সেনাবাহিনী। ক্ষমতাকাঠামোয় যেসব পরিবর্তন এসেছে, সেগুলো বিবেচনায় মনে হতে পারে যে তাতমাদোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে তা উধাও হয়ে যায়নি। বস্তুত, ২০০৮ সালের সংবিধানে তাতমাদোর ক্ষমতা আরও জোরদার করা হয়েছে (Egreteau, 2014)। ২০১১ সালে প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের নেতৃত্বে নতুন 'গণতান্ত্রিক' সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রীয় শান্তি ও উন্নয়ন কাউন্সিল (এসপিডিসি) বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু সংবিধানে যেকোনো ধরনের সাংবিধানিক সংকটে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় তাতমাদোর হাতে। তাতমাদো এবং প্রেসিডেন্টের হাতে এই ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থেকে যায়। এমনকি বিচার বিভাগের ওপরও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকে প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত। এ ছাড়া মিয়ানমারের প্রধান মন্ত্রণালয়গুলো, যেমন প্রতিরক্ষা এবং স্বরাষ্ট্র ও সীমান্তবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় দায়িত্বরত বা সাবেক সামারিক কর্মকর্তাদের (Bunte, 2011)। সংসদের দুই কক্ষেই (৪৪০ আসন—পিথু হ্লুত্তো বা নিম্নকক্ষে, এবং ২২৪ আসন—আমিওথা হ্লুত্তো বা উচ্চকক্ষে) এক-চতুর্থাংশ আসন তাতমাদোর জন্য বরাদ্দ রাখা হয় (Egreteau, 2017)। এসব কারণে সার্বিকভাবে গণহত্যা চালানো এবং প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গ্যারিসন রাষ্ট্রের ধরন বোঝার ও রাষ্ট্রক্ষমতায় তাতমাদোর প্রভাব আরও গভীরভাবে বুঝতে মিয়ানমার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে।

এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে মিয়ানমার রাষ্ট্র এবং সামরিক বাহিনী তথা তাতমাদোর বিবর্তন এবং দেশটির রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে এদের তাৎপর্য আরও বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মিয়ানমারে রাষ্ট্রনির্মাণ : শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও দুর্বল রাষ্ট্রকাঠামো

> মিয়ানমার রাষ্ট্রের ইতিহাস এবং এর সশস্ত্র বাহিনী গঠনের ইতিহাস একই সুতায় গাঁথা। ১৯৪১ সালের ২৬ ডিসেম্বর ব্যাংককে মিয়ানমারের জাতীয়তাবাদী ত্রিশজন কমরেড মিলে বার্মা ইনডিপেনডেন্স আর্মি (বিআইএ) গঠন করে। এই ত্রিশজন কমরেডকে ইতিহাসবিদেরা জাতি ও আধুনিক তাতমাদোর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করে (Myoe, 2009 : 98)।

সেদিন ব্যাংককে প্রতিষ্ঠাতা ত্রিশজনের সবাই নিজের শরীর থেকে এক সিরিঞ্জ রক্ত নিয়ে একটি সিলভারের পাত্রে মিশিয়ে একসঙ্গে পান করে। এর মাধ্যমে মিয়ানমারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। তখন থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত দেশটির স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাতমাদো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুরুতে কিছু সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অহিংসতা বজায় রাখলেও তাতমাদো নিজ দেশের ভেতরেই সংঘাতে লিপ্ত হয়, যা সাত দশক ধরে চলে (Paddock, 2018)।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা মিয়ানমারে আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা প্রচলন করে। তখন থেকেই রাষ্ট্র নির্মাণপ্রক্রিয়া অস্থিতিশীল হিসেবে রয়ে গেছে। এর কারণ হলো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তিত্বগত পার্থক্য (Nakanishi, 2013)। তবে উনিশ শতকে এই ধরনের উপনিবেশ শুধু মিয়ানমারই ছিল না।

এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও এ ধরনের অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। এর ফলে ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পরপরই মিয়ানমার ক্ষমতাশালী জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসহ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করে (Furnivall, 1991)। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক শাসকেরা চলে যাওয়ার পরপরই মিয়ানমার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মুখোমুখি হয়। এর ফলে সামরিক বাহিনীকে দ্রুত আধুনিকায়ন করার সুযোগ আসে। উপনিবেশোত্তর মিয়ানমারে সামরিক বাহিনী নির্মাণ করাই হয়ে ওঠে রাষ্ট্র নির্মাণের প্রধান কাজ। এর ফলে 'প্রথাগত অসামরিক ক্ষেত্রগুলোতেও সামরিক বাহিনীর সম্পদ, দায়িত্ব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়' (Callahan, 2005 : 18)।

মিয়ানমারে ১৯৪৭ সালের সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। একটি উদার সংবিধানের মতোই তাতমাদোকে বেসামরিক সরকারের নেতৃত্বের অধীনে রাখা হয়েছিল। তবে তাতমাদো নিজেকে বেসামরিক শ্রেষ্ঠত্বের অধীনে সীমাবদ্ধ রাখেনি। ধীরে ধীরে তাতমাদো নিজের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্প্রসারণ করেছে (Steinberg, 2013)। ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে তাতমাদোর বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং বেসামরিক কাজ নিজেরা করা শুরু করে এবং জাতীয় বাজেটের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর আধুনিকায়নে বরাদ্দ করতে চায় (Steinberg, 2013)। ১৯৫৮ সালের মধ্যেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভাজন চরমে

পৌঁছায়, যার ফলে সংসদীয় ব্যবস্থায় অস্থিরতা তৈরি হয়।

জেনারেল নে উইন তৎকালীন বেসামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইউ নুকে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য সাময়িকভাবে তাতমাদোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য করে। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বাধীন বিশেষ সরকার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়। তবে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল নে উইন পুনরায় ক্ষমতা দখল করেন। এর ফলে তাতমাদো আবারও রাষ্ট্রের চালকের আসনে বসে এবং 'তাদের বেসামরিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিরতরে মুছে ফেলে' (Callahan, 2001 : 422)।

প্রায়ই যুক্তি দেওয়া হয় যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউ নুয়ের রাষ্ট্রধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) নির্ধারণের ধারণাটি অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি, যে কারণে তাতমাদো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে উদ্বুদ্ধ হয় (Bunte, 2014)। তবে কয়েক দশক পর দেখা গেছে, কীভাবে সামরিক জান্তা মিয়ানমারে নিজ ক্ষমতা সংহত করতে ধর্মের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ ছাড়া চিহ্নিত করা হয়েছে যে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর জন্য আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার যে আহ্বান নু জানিয়েছিলেন, সেটিও রাজনীতিতে তাতমাদোর হস্তক্ষেপকে উদ্বুদ্ধ করেছিল (Bunte, 2014)। সে জন্য তাতমাদো চেয়েছিল সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর যেকোনো ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদের সম্ভাবনা অথবা রাষ্ট্রের প্রান্তে যেকোনো ধরনের ক্ষমতার কেন্দ্র আবির্ভূত হওয়া বলপ্রয়োগ করে ঠেকাতে।

'সমাজতন্ত্রের বার্মিজ পদ্ধতি' নামক ১৯৬২ সালের অর্থনৈতিক চুক্তিতে তাতমাদোর অভ্যুত্থানের নেতারা তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা স্পষ্ট করে তোলে। সেখানে যুক্তি দেওয়া হয় যে 'স্থানীয় বার্মিজ জনগোষ্ঠীকে বাণিজ্যমনস্ক "সামন্ততন্ত্রবাদী" এবং "সাম্রাজ্যবাদীদের" বিভিন্ন ধরনের শোষণ থেকে রক্ষা করতে সামরিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ছিল' (McCarthy, 2019 : 9)। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউ নুয়ের সঙ্গে 'জমিদার ও পুঁজিবাদীদের' যোগসাজশ থাকার অভিযোগে তাতমাদো তাঁর ব্যাপক সমালোচনা করে। তাতমাদো রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার লক্ষ্য স্থির করে (McCarthy, 2019 : 9)। এখান থেকেই ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে মিয়ানমার একটি শক্তিশালী, কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা পরিচালনার দায়িত্বে থাকে তাতমাদো।

সামরিক বাহিনীর শাসনব্যবস্থার অ্যাজেন্ডা অনেক সময় সমাজতন্ত্রের ব্যর্থ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মিলে যায়। মিয়ানমারও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল না। বিপ্লবী কাউন্সিল নামে একটি একক শাসন পর্ষদ গঠনের মাধ্যমে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত জেনারেল নে উইন শাসন চালিয়ে যায়। এই কাউন্সিল জরুরি অবস্থা জারি করে, সংসদ ভেঙে

দেয় এবং সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে। এ ছাড়া 'সমাজতন্ত্রের বার্মিজ পদ্ধতির' ব্যানারে এই কাউন্সিল অর্থনীতিকে জাতীয়করণ করে (Callahan, 2005 : 157)। নিজ শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নে উইন বার্মিজ সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি (বিএসপিপি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। দলটি ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার চালায়। সমাজতান্ত্রিক একদলীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতার কারখানা হয়ে ওঠে তাতমাদো। ১৯৭৪ সালে জেনারেল নে উইন দলের চেয়ারম্যান এবং রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন (Callahan, 2005)। তিনি দায়িত্বরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের সক্রিয় রাজনীতিতে নিযুক্ত করেন। তিনি এসব কর্মকর্তাকে মন্ত্রিসভা এবং রাবার স্ট্যাম্প বা নামকাওয়াস্তে সংসদে নিয়োগ দেন। এ ছাড়া অনেক দায়িত্বরত কর্মকর্তাকেও রাজনৈতিক দলে পদ-পদবি দেওয়া হয় (Callahan, 2005)। সে জন্য মিয়ানমারের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র, তাতমাদো এবং দলের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন।

জেনারেল নে উইনের বিএসপিপি গণপ্রতিবাদ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়। এমনই একটি গণপ্রতিবাদ দমন করতে গিয়ে ১৯৮৮ সালে দলটির পতন ঘটে। এর ফলে তাতমাদো সরাসরি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের আরেকটি সুযোগ পেয়ে যায়। নতুন শাসনামলে, তাতমাদো রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা কাউন্সিল (এসএলওআরসি) গঠন করে, যা পরে ১৯৯৭ সালে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও উন্নয়ন কাউন্সিল (এসপিডিসি) হিসেবে পুনরায় নাম দেওয়া হয়। সামরিক সরকার সফলভাবে বেসামরিক প্রতিবাদ দমন করে এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া তারা তাতমাদোকে মিয়ানমারের সবচেয়ে সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনরায় গড়ে তোলে, যার রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় (Kyaw, 2007)। ১৯৬২ সাল থেকে মিয়ানমারে ধারাবাহিক সরকারগুলো চেয়েছে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলির জন্য একমাত্র সক্ষম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাতমাদোর শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করতে। বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় তাতমাদো সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। কিন্তু এর ফলে ক্ষমতাসীন এলিটরা তাতমাদোর ক্ষমতা আরও বাড়ানোর মাধ্যমে নিজেদের শক্তি সংহত করার যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পায় (Kyaw, 2003)। বিভিন্ন ঘটনায়, বেসামরিক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও ক্ষমতাসীনেরা সহযোগিতা পেতে চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং সন্ন্যাসী সংগঠনগুলো এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এরা সামরিক সরকারের বিস্তৃত বৈধতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে।

সমাজের বেসামরিক অংশে প্রবেশ করা ছাড়াও দায়িত্বরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী পদে বসিয়েছে তাতমাদো। এসব পদের মধ্যে রয়েছে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকার

এবং প্রশাসনিক চাকরিতেও এটি লক্ষ করা গেছে। সেখানে সামরিক কর্মকর্তাদের পদবি দেওয়া হয়েছিল যেন এই প্ল্যাটফর্মগুলো তারা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পরিচালনা করতে পারে (Taylor, 2009)। স্থানীয় সরকারের এই প্রশাসকেরা রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি তারা করেছে স্থানীয় নীতি প্রণয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং কর আদায়ের মাধ্যমে। আর এভাবেই তারা শাসনব্যবস্থার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছে (Callahan, 2007)।

মিয়ানমারের রাজনীতি বেসামরিক দিকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়েছিল যখন দেশটিকে তথাকথিত শৃঙ্খলাবদ্ধ গণতন্ত্রে রূপান্তরের ইচ্ছা পোষণ করা হয়। ২০০৮ সালে একটি নতুন সংবিধানের খসড়া করা হয়। তা সত্ত্বেও একটি কার্যকর বেসামরিক নেতৃত্বের অধীনে তাতমাদোকে রাখার মৌলিক বিধান নিশ্চিত করা যায়নি (Kyaw, 2012)। এ ছাড়া ২০০৮ সালের সংবিধানে ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির নেত্রী অং সান সু চিকে প্রেসিডেন্টের পদে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এর কারণ তাঁর স্বামীর ব্রিটিশ নাগরিকত্ব (Steinberg, 2013)। নির্বাচন প্রভাবিত করা এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণের পুরোনো দৃশ্যকল্পসহ নতুন প্ল্যাটফর্ম গঠন এখনো মিয়ানমারে চলমান রয়েছে। রাষ্ট্রীয় শান্তি ও উন্নয়ন কাউন্সিল ২০১০ সালের নির্বাচনও এমনভাবে প্রভাবিত করেছে, যা সামরিক আধিপত্য নিশ্চিত করেছিল।

২০১০ সালে সরকার একটি নতুন দল গঠন করে। এর নাম হলো ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি)। এটি ছিল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (ইউএসডিএ) একটি শাখা। এটি একটি সাহায্য এবং গণসামাজিক কল্যাণ সংগঠন, যার প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ সদস্য রয়েছে। এটি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠা করে এসএলওআরসি (Bunte, 2014)। সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল থেইন সেইন ছিলেন ইউএসডিপির নেতা। এটি স্পষ্ট যে অনেক দায়িত্বরত সামরিক কর্মকর্তা ২০১০ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগেই এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইউএসডিপি বিপুল আসনে জয়লাভ করে—নিম্নকক্ষে ৮০ শতাংশ আসন আর উচ্চকক্ষে ৭৭ শতাংশ আসন পায় (Bunte, 2014)।

তাতমাদোর সাবেক চার তারকা জেনারেল হয়ে ওঠেন একজন ক্ষমতাশালী মানুষ—দেশের প্রেসিডেন্ট। যদিও ইউএসডিপির নেতৃত্বাধীন সরকারকে সরাসরি সামরিক শাসন বলা যাবে না, কিন্তু এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মিয়ানমারের রাজনীতিতে তাতমাদো কখনোই পেছনের আসনে থাকেনি। সংসদে তাতমাদোর ক্ষমতা সংহতকরণে থেইন সেইনের ভূমিকা বোঝার জন্য নিচের অংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ :

২০১১ সালের মার্চ মাসে থেইন সেইন নিজের মন্ত্রিসভার সদস্যদের একটি বাছাই

করা তালিকা ঘোষণা করেন। এই তালিকায় ২৬ জন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা বা সাবেক জান্তা মন্ত্রী, আর বেসামরিক সদস্য ছিলেন মাত্র ৪ জন। ২০১২ সালের আগস্ট মাসে মন্ত্রিসভায় রদবদলের পর বেসামরিক সদস্যসংখ্যা অল্প কিছু বেড়েছিল। কারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত মন্ত্রণালয়গুলোয় টেকনোক্র্যাটদের বসানো হয়েছিল। আঞ্চলিক সরকারগুলোতেও তাতমাদোর প্রতিনিধিত্ব ছিল। বিভাগ এবং রাজ্যপর্যায়ে পনেরোজন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ছয়জন ছিলেন সাবেক এসপিডিসি অধিনায়ক এবং তিনজন ছিলেন সাবেক এসপিডিসি মন্ত্রী (১ নম্বর টেবিল দেখুন) (Bunte, 2014 : 753-4)। ২০১৬ সাল থেকে অং সান সু চির এনএলডি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা লাভ করে। তবে মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলো তখনো উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের দখলে ছিল।

মিয়ানমারের তাতমাদো সর্বদাই তার শক্তিশালী চরিত্র বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। রাজনীতির সামরিকায়নের প্রভাব বুঝতে গেলে ২০১৫ সালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন-পরবর্তী সরকারব্যবস্থা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

টেবিল ১ : মিয়ানমারে নির্বাহী ভূমিকায় সামরিক বাহিনী : তুলনামূলক চিত্র

মন্ত্রণালয়	২০১১-১৬	২০১৬-২০	১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ [সামরিক ক্যু-পরবর্তী সরকার]
রাষ্ট্রপ্রধান	থেইন সেইন (সাবেক জেনারেল)	হিতিন কিয়াও (৩০ মার্চ ২০১৬-২১ মার্চ ২০১৮) উইন মিন্ট (৩০ মার্চ ২০১৮-৩১ জানুয়ারি ২০২১)	মিন্ট সোয়ে
উপপ্রধান	তিন অং মিয়ান্ট ও সাই মুক খাম নিয়ান তুন	অং সান সু চি (রাষ্ট্রীয় পরামর্শক) ও পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী	X
সীমান্তবিষয়ক মন্ত্রী	লেফটেন্যান্ট জেনারেল থেট নাইং উইন	লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়ে অং	লেফটেন্যান্ট জেনারেল তুন তুন নাউং
সীমান্তবিষয়ক উপমন্ত্রী		মেজর জেনারেল থান তুত	X

মন্ত্রণালয়	২০১১-১৬	২০১৬-২০	১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ [সামরিক ক্যু-পরবর্তী সরকার]
প্রতিরক্ষামন্ত্রী	লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াই লুইন	লেফটেন্যান্ট জেনারেল সেইন উইন	জেনারেল মিয়া তুন ও
প্রতিরক্ষা উপমন্ত্রী		রিয়ার অ্যাডমিরাল মিয়ান্ট নিউ	X
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	লেফটেন্যান্ট জেনারেল কো কো	লেফটেন্যান্ট জেনারেল কোয়াও সুইয়ি (৩০ মার্চ ২০১৬-২১ মার্চ ২০১৮) লেফটেন্যান্ট জেনারেল সোয়ে তুত (৩০ মার্চ ২০১৮-৩১ জানুয়ারি ২০২১)	লেফটেন্যান্ট জেনারেল সোয়ে তুত
স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী		মেজর জেনারেল অং সো	X
পরিবহন ও যোগাযোগমন্ত্রী			জেনারেল তিন অং সান

সূত্র : লেখকের সংকলন

২০১৫-এর নভেম্বরের নির্বাচন এবং মিয়ানমারের গ্যারিসন গণতন্ত্র

মিয়ানমারে ২০১৫ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আসে। এ নির্বাচনে ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) নামক দলটি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। এই দলটি ছিল মূল বিরোধী দল, যারা মিয়ানমারে দীর্ঘায়িত সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তবে নিকোলাস ফারেলি (২০১৬) দেখিয়েছেন এনএলডির চরিত্র এবং অং সান সু চির রাজনীতিতে কোন জিনিসগুলো পরিবর্তন হয়নি। পরিহাসের বিষয় হলো, সবচেয়ে ভালো সময়েও স্বচ্ছতার মডেল বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা থেকে এনএলডি বহু দূরে থেকেছে। একদম সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কর্তৃত্বপরায়ণ প্রবৃত্তি শুরু হয়; সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অং সান সু চির কঠোর নিয়ন্ত্রণ

থাকে। যা বদলায়নি তা হলো তীব্র ব্যক্তিগত আনুগত্য পাওয়ার জন্য সু চির ঠিক করে দেওয়া বাধ্যবাধকতা এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্ব নিজের কাছে রাখার প্রয়োজনীয়তা (Farrelly, 2016)।

মিয়ানমারের গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার ওপর এই ঘটনার একটি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এনএলডি প্রশাসন এবং এর নেতৃত্ব বিভিন্ন বেসামরিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানকে শাসনব্যবস্থায় প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে গেছে (Myoe, 2018)। সে জন্য ২০১৬ সাল-পরবর্তী শাসনব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক বিষয়াবলির ওপর প্রভাব ধরে রাখার আরও বেশি পরিসর দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্র বিষয়াবলিতে। মুং অং মুইয়ো (২০১৮) আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সু চি এবং তাঁর সরকার সংসদ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাতমাদোর 'প্রভাবের ভাবমূর্তি' কমিয়ে বিদ্যমান সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক সংস্কার করতে পারেনি। এর বিপরীতে তাতমাদো নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজেদের অংশগ্রহণ বিস্তৃত করে গণযোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করেছে, যেমন দুর্যোগ ত্রাণ, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা দল এবং সামরিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নৈতিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ নেওয়ায় তাতমাদোর অংশগ্রহণ (Myoe, 2018)।

এ ছাড়া তাতমাদো প্রথাগত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনে ভূমিকা রাখার কারণে আরও বেশি জনসমর্থন অর্জন করে। ২০১৬ সালের অক্টোবর এবং ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরাকানে নিরাপত্তাচৌকিগুলোতে হামলা চালায় আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা)। এর ফলে তাতমাদোর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতা দমনে বেশ কিছু সশস্ত্র অভিযান চালানো হয়। এসব অভিযানে রোহিঙ্গাদের বহু বসতভিটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের বাস্তুচ্যুত করার পাশাপাশি হত্যা করা হয়। এর ফলে সাড়ে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গার গণ-অভিবাসন ঘটে বাংলাদেশে (Cheesman, 2017)। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাতমাদোর ওপর মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ—যেমন নির্যাতন, হত্যা এবং ধর্ষণের যত অভিযোগ এনেছে, তাতমাদো এর সবই অস্বীকার করেছে।

অং সান সু চি স্পষ্টতই সহিংসতা, নির্যাতন এবং রোহিঙ্গাদের হত্যা করার বিষয়ে নিশ্চুপ থেকেছে। উল্টো রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করে তাদের মিয়ানমারের বৈধ নাগরিক নয় বলে ঘোষণা দিয়েছে (Chambers and McCarthy, 2018; Cheesman, 2017)। এখান থেকে বোঝা যায় যে বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন এবং জাতীয় সমঝোতা প্রক্রিয়ায় এনএলডি দলটিও তাতমাদোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। এটিও বোঝা যায় যে এনএলডি এবং সু চির ওপর তাতমাদো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। মিয়ানমারের নীতিনির্ধারণ এবং শাসনব্যবস্থায় এনএলডি দলটির দুর্বল অবস্থানের সুযোগ কাজে লাগিয়েছে তাতমাদো।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বেসামরিক নেতাদের দুর্বলতার কারণে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা প্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে পেরেছে তাতমাদো। যে কেউ আশাবাদী হয়ে যুক্তি দিতে পারে যে ২০১৫ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর ক্ষুদ্র পরিসরের শাসনব্যবস্থায় তাতমাদোর প্রভাব কমেছে। শক্তিশালী সূচকে দেখা যায় যে সংসদ এবং সরকারের কেন্দ্রীয় নির্বাহী অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোয় তাতমাদো নিজের প্রভাব বজায় রাখতে সক্রিয় রয়েছে। তাতমাদোর ক্ষমতার ভিত্তি বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো মিয়ানমারের সংবিধানমতে, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই সামরিক বিষয়াবলিতে অভিজ্ঞ হতে হবে। এ ছাড়া সংসদের ২৫ শতাংশ আসন তাতমাদোর জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা রাখে (Ibrahim, 2016)। যেহেতু যেকোনো ধরনের সাংবিধানিক সংশোধনীর জন্য তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার, তাই বাড়তি কোনো ধরনের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাতমাদো কার্যকরভাবে ভেটো ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে। সে জন্য মিয়ানমারের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা কমানোর উদ্দেশ্যে নেওয়া যেকোনো ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন।

ওপরের দুটি ভাগে বর্ণিত আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে মিয়ানমারের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে—তা সেটি ইউএসডিপি (২০১১-২০১৫) বা এনএলডি (২০১৬-২০) যে শাসনামলে হোক না কেন, তাতমাদোর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতায় পরিণত হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় মিয়ানমারে গত নভেম্বর ২০২০-এর নির্বাচনে অং সান সু চির ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) বিপুল ভোটে জয় পায়। তাতে নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে সেনাবাহিনী এই নির্বাচন বাতিল করার ব্যাপারে চাপ তৈরি করতে থাকে। সর্বশেষ তাতমাদো নতুন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে ২০২১-এর ১ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে।

যদিও-বা অনেকে ভেবে থাকতে পারেন, ২০১৫-পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র কি কিছুটা সুসংহত হয়েছিল? কিন্তু ২০২১ সালে তাতমাদোর প্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের নেতৃত্বে সু চির নবনির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। মিয়ানমারের এই দুর্বল গণতান্ত্রিক কাঠামো ব্যাখ্যায় গ্যারিসন রাষ্ট্রের দুটি ধারণা সহায়ক হতে পারে। প্রথমত, মিয়ানমারের রাজনীতিতে তাতমাদো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করেছে তাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার জন্য। নিজেদের ক্ষমতাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য তারা বিরোধী রাজনৈতিক দলকে কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এলিটদের ওপর একধরনের নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি আরোপ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত বিরোধী গণতন্ত্রপন্থী রাজনীতিকেরা এবং মিয়ানমারের সুশীল সমাজ আলাদা করে সামরিকায়নের বাইরে নিজেদের ভিন্ন

কোনো গণ্ডি যেন তৈরি করতে সক্ষম না হয়। ফলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনামলে মিয়ানমারে তাতমাদোর ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং ক্ষমতায় তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের স্পৃহাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

গ্যারিসন রাষ্ট্র এবং জাতীয় জাতি নির্মাণ

এই অংশে মিয়ানমারে তাইঙ্গিনথা বা 'জাতীয় জাতির' (National Race) ধারণার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি তাতমাদোর নেতৃত্বাধীন একটি পোষ্য প্রকল্প, যার মাধ্যমে শুধু মিয়ানমারে সংখ্যালঘু সৃষ্টির নকশাই করা হয়নি, বরং উপনিবেশোত্তর সময় থেকে রাষ্ট্রের প্রান্তে দীর্ঘায়িত জাতিগত সহিংসতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিয়ানমারে তাইঙ্গিনথা একটি রাজনৈতিক ধারণা, যা একটি একক এবং 'জাতীয়' জাতি নির্মাণ বোঝায়। গবেষকেরা যুক্তি দিয়েছেন, এই ধারণা নৃশংস জাতিগত সংঘাত, যেমন আরাকানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, জাতিগত নির্মূল এবং গণহত্যার অন্যান্য ঘটনাকেও উসকে দিয়েছে (Green et al., 2015; Ibrahim, 2016; Zarni and Cowley, 2014)।

মিয়ানমারের তাতমাদো তাইঙ্গিনথার ধারণা কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজেদের বোঝাপড়া সংহত করেছে। জেনারেল নে উইন এই ধারণাকে আঁকড়ে ধরে অনুরোধ জানান যে :

> তাইঙ্গিনথার প্রত্যেকের মেনে নেওয়া দরকার যে অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল এবং একতাবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের মৌলিক বিষয় হলো সকল তাইঙ্গিনথার মধ্যে সৌহার্দ্য এবং ঐক্য। সকল তাইঙ্গিনথার মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্যের কথা বলার মানে হলো কাচিন, কারেন, চিন, বর্মন, শান এবং অন্য জাতি যারা বার্মা ইউনিয়নের মধ্যে বসবাস করছে, তাদের জীবনভর ভালো-মন্দে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে। তখনই শুধু তাইঙ্গিনথা একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাতে সক্ষম হবে এবং বার্মা ইউনিয়ন এবং এর সকল বাসিন্দার মঙ্গলের জন্য বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পারবে (Cheesman, 2017 : 308)।

তখন থেকেই জাতীয় জাতি নির্মাণের ধারণা রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য সৃষ্টি করে আসছে এবং আইনি মর্যাদার কারসাজি, সম্পদের জাতীয়করণ এবং অভিযুক্ত বিদেশিদের দেশ থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে বিযুক্তির (এক্সক্লুশন) নীতি তৈরি করছে। সংবিধানের আইনি কাঠামো রূপান্তরের মাধ্যমে তাইঙ্গিনথার ধারণা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে সামরিক জান্তা। এর উদ্দেশ্য হলো একটি একক জাতি গঠন করা, যা দেশের বাইরে ও ভেতরে একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এ ছাড়া এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে দীর্ঘায়িত সংঘাতের কারণে দুর্দশার মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিক করা হয়েছে এবং ঐক্যবদ্ধতার নামে দেশের প্রান্তিক এলাকাতেও তাতমাদোর হস্তক্ষেপকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে (Walton, 2013)।

২০১০ সালে তথাকথিত বেসামরিক সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পরও তাতমাদোর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব থেকে যায়। আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গা বিষয়টি এই তাইঙ্গিনথা ধারণার আশ্রয় নিয়েই তাতমাদো সহিংসতা চালিয়েছে। ২০১২ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) প্রধানের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্টভাবে জানান যে যারা হামলার হাত থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে, সরকার 'আমাদের তাইঙ্গিনথার দায়িত্ব নেবে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাইঙ্গিনথার বাইরে "রোহিঙ্গারা" অবৈধভাবে প্রবেশ করলে তা মেনে নেওয়া হবে না (Cheesman, 2017 : 13)। সে জন্য মিয়ানমারের তখনকার সরকারও তাদের পূর্বসূরিদের অবস্থান ধরে রেখেছিল এবং রোহিঙ্গাদের বাংলাভাষী মুসলিম এবং অ-তাইঙ্গিনথা হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

২০১৩ সালে জাতীয় পরিষদের তখনকার স্পিকার রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে খুবই সোচ্চার ছিলেন। তিনি রাখাইন রাজ্যে আরও বেশি সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি জানান যেন অতিরিক্ত 'বাঙালি জনগোষ্ঠীর' হাত থেকে তাইঙ্গিনথাদের সুরক্ষা দেওয়া যায়। এখান থেকে দেখা যায় কীভাবে রাজনীতিবিদেরা মিয়ানমারের একক জাতির ধারণার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে থাকে (Cheesman, 2017)। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব মিয়ানমার ভ্রমণে যান এবং সেখানে গিয়ে বিপন্ন অবস্থায় থাকা রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। মিয়ানমারের সরকারি-বেসরকারি জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে এই আহ্বানের সমালোচনা করে। কয়েকটি জনসমাগমে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি জাতিসংঘের মহাসচিবের নিন্দা করেন; কারণ, মহাসচিব 'রোহিঙ্গা' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন :

> রোহিঙ্গা যারা মিয়ানমারের তাইঙ্গিনথা নয়, তাদের কথা উল্লেখ করে বান কি মুন একটি রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন [বাংলাদেশ থেকে লোক আসার]। আমরা যদি বলি যে সেখানে রোহিঙ্গারা আছে, তাহলে আমরা কি সেখান থেকে যে কেউ নিজেদের রোহিঙ্গা বলে দাবি করে মিয়ানমারে আসবে, তাদের মেনে নেব? বাস্তবে তারা প্রকৃত তাইঙ্গিনথা নয় (Cheesman, 2017 : 13)।

২০১৬ সালের নির্বাচনের পর এনএলডি সরকার জাতীয় জাতি নির্মাণের ব্যাপারে পূর্বসূরিদের বিদ্যমান নীতি বদলায়নি। রাষ্ট্রহীন সংখ্যালঘু, যেমন রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত করতে ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন, ২০০৮ সালের সাংবিধানিক বিধান বা অন্যান্য আইনি কাঠামো সংস্কারে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেয়নি এনএলডি সরকার। অধিকন্তু মিয়ানমারের নাগরিক এবং জাতীয় রাজনীতিবিদেরা রোহিঙ্গাদের ক্রমাগত রাষ্ট্র এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখে আসছে (Brooten and Verbruggen, 2017)। বৌদ্ধ ভিক্ষু, নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং সাধারণ নাগরিকেরা

প্রায়ই এই নিরাপত্তাকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হয়েছে (Chambers and McCarthy, 2018)। অং সান সু চির বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে তিনিও তাঁর পূর্বসূরির অবস্থান ধরে রেখে রোহিঙ্গাদের জাতীয় জাতির অংশ হিসেবে অস্বীকার করেছেন এবং তাদের বিদেশি হিসেবে দেখেছেন (Cheesman, 2017)। সে জন্য এটি উদ্বেগের বিষয় যে কীভাবে সংখ্যালঘুদের বিযুক্ত করার বিষয়টি বেসামরিক রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে রাজনৈতিক সমর্থন পেয়েছে এবং বেসামরিক রাজনৈতিক দলগুলোও তাতমাদোর উত্তরাধিকারের সম্প্রসারণ হিসেবেই রয়ে গেছে।

ওপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে, কীভাবে মিয়ানমার সরকার একটি বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে একটি জাতীয় জাতি নির্মাণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে। তাইঙ্গিনথা বা জাতীয় জাতি নির্মাণ রাজনৈতিকভাবে এবং আইনিভাবে মিয়ানমারের রাজনৈতিক এলিটদের একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প। সশস্ত্র বাহিনীসহ রাজনৈতিক এলিটরা শুধু এমন একটি ব্যবস্থাই বৈধ করতে চাইবে, যা ক্ষমতাকাঠামোয় তাদের অবস্থান বজায় রাখবে। জাতীয় জাতি নির্মাণ এবং কারও জাতীয়তা বাতিল করার ভিত্তির ব্যাপারে কারও প্রশ্ন করার অধিকার তারা দেয় না। বিযুক্তিমূলক রাষ্ট্রের কারণ নিয়ে প্রশ্ন করা তো দূরে থাক, অন্তর্ভুক্তি বা বিযুক্তির কারণ নিয়েও কেউ প্রশ্ন করতে পারে না। এটি দৈবক্রমে ঘটেছে এমন ধরে নেওয়া ভুল (Kyaw, 2015)। সে জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো শাসকদের খদ্দের হয়ে থাকতে চায়, যেন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দাবার ছক থেকে তারা বিলীন হয়ে না পড়ে।

গ্যারিসন রাষ্ট্রে গণহত্যা ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার চালচিত্র—আরাকানের রোহিঙ্গারা

মিয়ানমারে তাতমাদো বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন করার নীতি চালিয়ে যেতে জাতীয় জাতি এবং সংখ্যালঘু নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়াবলির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এই অংশে যুক্তি দেওয়া হবে যে বিযুক্তিমূলক (এক্সক্লুশনারি) রাষ্ট্র হয়ে ওঠার প্রতি গ্যারিসন রাষ্ট্রের একটি জোরালো ঝোঁক থাকে। এই ধরনের বিযুক্তিমূলক রাষ্ট্রের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ হলো মিয়ানমার, যেখানে সংখ্যালঘুবিরোধী (যেমন রোহিঙ্গাবিরোধী) মনোভাব হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের জাতীয় মূল্যবোধ। এর প্রধান কারণ হলো গ্যারিসন রাষ্ট্র ভাবতে বাধ্য হয় যে এটি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে আসা অস্তিত্বের প্রতি হুমকির বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করছে। কর্তৃত্বপরায়ণ শাসক এবং তাতমাদো সফলভাবে আরাকানের রোহিঙ্গাদের মতো জাতিগত সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে আসা অস্তিত্বের হুমকিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে পেরেছে। তাই জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি থেকে সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করতে রাষ্ট্র অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে ওঠে।

১৯৭০-এর দশকে জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের উৎস ছিল 'সমাজতন্ত্রের বার্মিজ পদ্ধতির' ব্যর্থতা। সে জন্য তখনকার শাসকদের একটি অজুহাত দরকার ছিল নিজেদের অপকর্ম আড়াল করার। আরাকানের রোহিঙ্গাদের নির্যাতন করে সেই অজুহাত তারা পেয়ে গিয়েছিল। কারণ, দেশের অন্য সব সংখ্যালঘুর তুলনায় রোহিঙ্গারা সবচেয়ে বেশি দুর্বল। এর কারণ, দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। নাগরিকত্ব আইন বাতিল করে দিয়ে সামরিক সরকার 'অন্যদের' বিযুক্ত করেছিল। নাগরিকত্বের ভিত্তি হিসেবে তারা বৌদ্ধিক পরিচয় ব্যবহার করেছিল (Ibrahim, 2016)। মিয়ানমারে এই 'অন্যদের' সব মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এ ছাড়া ১৯৯০-এর দশকের আইনি কাঠামোগুলোয় রোহিঙ্গাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কারণ, তাদের বিদেশি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এসব আইনের মাধ্যমে নিয়ম করে দেওয়া হয় যে রোহিঙ্গারা দুটোর বেশি সন্তান নিতে পারবে না। এ ছাড়া জোরপূর্বক জন্মনিয়ন্ত্রণ চালু করে এবং বিয়েশাদির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে (AHRC, 2011)। এসব বিধিনিষেধের কারণে সরকারি কর্মকর্তারা মানুষের বাড়িঘরে হানা দিয়ে তল্লাশি চালাত। এ ছাড়া রোহিঙ্গারা চাইলেও ভ্রমণ করতে পারত না, এমনকি রাখাইনের শহরগুলোর মধ্যেই তারা অনুমোদন ছাড়া ভ্রমণ করতে পারত না।

ম্যাথু ওয়ালটন যুক্তি দেন, '[মিয়ানমারে] বৌদ্ধধর্ম ও জাতীয়তাবাদ প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে।' ২০০৮ সালের সংবিধান রাষ্ট্রের বিযুক্তিমূলক চরিত্রকে আরও শক্তিশালী করেছে। ১৯৭৪ সালের সংবিধান এবং ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের চেয়েও ২০০৮ সালের সংবিধান বেশি বিধিনিষেধমূলক।

নতুন সংবিধানে নাগরিকত্ব দেওয়া শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, যাদের ইতিমধ্যে নাগরিক হিসেবে মনে করা হয় বা যেসব সন্তানের 'পিতা-মাতা দুজনই ইতিমধ্যে নাগরিক' (Ibrahim, 2016 : 73)। যেহেতু আরাকানের রোহিঙ্গারা ঐতিহাসিকভাবেই মিয়ানমারের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাই তাদের সন্তানেরা সেখানে জন্ম নিচ্ছে, বেড়ে উঠছে, কিন্তু তবু তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে তারা নির্যাতনের শিকার হয়।

এটি ১৯৬১ সালের জাতিসংঘের রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ কনভেনশনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এই কনভেনশনের ১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে 'চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করা কোনো ব্যক্তির যদি রাষ্ট্রহীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করবে' (Ibrahim, 2016 : 73)।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, বিশাল ও জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশটির শাসনব্যবস্থার ওপর সু চির এনএলডি সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি (Xu and Albert, 2016)। প্রথমত, বেসামরিক সরকার যেহেতু দীর্ঘদিন শাসনব্যবস্থার

বাইরে ছিল, তাই তাদের অভিজ্ঞতা ছিল কম। দ্বিতীয়ত, তাতমাদোকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই সরকার সাংবিধানিকভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজনীতিতে তাতমাদোই ছিল সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী গোষ্ঠী। ক্ষমতাসীন দল এনএলডি এবং অং সান সু চি তাতমাদোর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আত্মপ্রসাদে ভুগেছে। আর তা করতে গিয়ে তারা আরাকানে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতা, নির্যাতন এবং মৃত্যু উপেক্ষা করে গেছে।

যে কেউ পাল্টা যুক্তি দিতে পারে যে একটি মূলধারার রাজনৈতিক দলের পক্ষে রোহিঙ্গাদের অবস্থা তুলে ধরা এবং সে লক্ষ্যে মানুষকে সংগঠিত করা সমীচীন হতো না, বিশেষ করে ২০১৫ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে। কিন্তু দলটির কেন্দ্রীয় মনোযোগ ছিল সেসব বিষয়, যেগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর প্রভাব ফেলে। কারণ, তারাই মূল ভোটব্যাংক। রোহিঙ্গাদের ভোট দেওয়া এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের দমন করার প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয় এবং মিয়ানমারে বৌদ্ধ-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটানো হয়।

বিযুক্তিমূলক রাষ্ট্র হওয়া ছাড়াও মিয়ানমার এমন এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যা এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে থাকা যেকোনো ধরনের বেসামরিক পরিসরের প্রতি অসহিষ্ণু। সে জন্য মিয়ানমারে বেসামরিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর (যেমন নাগরিক সমাজ বা গোষ্ঠী) অস্তিত্ব পাওয়া যাবে শুধু তাদেরই, যারা সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বাধীন এলিট রাজনীতিতে প্রোথিত। নাগরিক সমাজ নিজের অস্তিত্বের প্রতি হুমকির মুখোমুখি হয়েছে এবং রাষ্ট্রের 'অভিভাবক' হিসেবে পরিচিত তাতমাদোর প্রভুত্বশীল আখ্যানের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, কীভাবে একটি তাৎক্ষণিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে মিয়ানমারের রূপান্তর ঘটেছে এবং তাতমাদোর শক্তিশালী সদস্যরা দেশটি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। যে কেউ তুলনামূলক কম যুক্তি দিয়ে বলতে পারে যে এলিটরাই ওপর থেকে নিচ পদ্ধতিতে মিয়ানমারের উত্তরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ ক্ষেত্রে নিচ থেকে শক্তি হয়ে উঠতে নাগরিক সমাজ ব্যর্থ হয়েছে (McCarthy, 2012)। গ্যারিসন শক্তির দীর্ঘায়িত আধিপত্যের কারণে নিরপেক্ষ নাগরিক শক্তি সংহত হতে পারেনি, যা প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর ঘটা অন্যায় এবং বিযুক্তির বিরুদ্ধে কার্যকরী শক্তি হিসেবে লড়াই করবে। মিয়ানমারে নাগরিক সমাজের পরিসর সীমিত এবং তা গ্যারিসন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যেই প্রোথিত। রাষ্ট্র এর নাগরিক সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে নজরদারি করে থাকে। তাদের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড এবং কল্যাণমূলক সেবা সব সময়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধীনে নিয়ে আসা হয়। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের অনুমতি পাবেই—এমনটি বলা যায় না (McCarthy, 2012)। রাজনীতি ও সমাজে সংস্কারকও রয়েছে, যারা সামাজিক শক্তিগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে উদ্দীপ্ত। কিন্তু তাদের কাজের সাফল্য সব সময়ই নির্ভর

করে সরকারের মধ্যে থাকা সংস্কারক এবং কঠোর অবস্থান গ্রহণকারীদের মধ্যকার উত্তেজনার ওপর, বিশেষ করে তাতমাদোর জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের ওপর।

মিয়ানমারে নাগরিক সমাজের পরিসর কিংবা কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন এবং এনজিওগুলোর কাজের স্বাধীনতায় ভিন্নতা রয়েছে। নিজ ভূখণ্ডে ক্ষমতা বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতা অনুযায়ী এই ভিন্নতা তৈরি হয়। সাধারণত দেখা যায় কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলো কম সক্রিয় কিংবা সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোয় খুবই কম পরিসর পাচ্ছে। এ ছাড়া ২০১৫ সালে আধা বেসামরিক সরকারও যেসব জায়গায় পর্যাপ্ত সেবা দিতে পারছিল না, সেখানে স্বাধীন নাগরিক সমাজের কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা সহজতর করতে তেমন কোনো উৎসাহমূলক লক্ষণ দেখায়নি। এর ফলে রাষ্ট্র এবং এর তাতমাদো যখন রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে জাতিগত নির্মূল বা গণহত্যা চালায়, তখন নাগরিক সমাজের পক্ষে এর বিরোধিতা করার নজির নেই বললেই চলে। 'মিয়ানমারের নাগরিক সমাজ এবং একটি মুক্ত, সমতাভিত্তিক এবং শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের কল্পনা জনসমক্ষে দেখার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সক্ষমতা নগণ্য হয়েই থাকবে, যতক্ষণ না তারা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় গণহত্যা স্বীকার করবে' (Green, 2018)।

দুর্ভাগ্যক্রমে এনজিও এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতো নাগরিক সমাজ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকারের রক্ষক নয়। মিয়ানমারে প্রায় সব মানবাধিকারভিত্তিক গোষ্ঠী সরকারের রাজনৈতিক গৎবাঁধা বয়ান গ্রহণ করে। ফলে রোহিঙ্গাদের তারা 'অবৈধ বাঙালি অভিবাসী' বলে মনে করে (Zin, 2014)। এর ফলে গভীরভাবে বর্ণবাদী জাতীয় তাড়না আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রোহিঙ্গাদের জাতীয় জাতি ধারণার বাইরের জাতি হিসেবে নির্মাণ করাকে সহজ করেছে। তাদের দেখা হয় সমাজের জন্য অভিবাসন ও নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে। তাদের বিষয়গুলোকে মানবাধিকার বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। সে জন্য তাদের দুর্দশা সবচেয়ে বেশি। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় যে নারীর অধিকার এবং ভূমি দখলের করপোরেট ও সামরিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রাখাইনের নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোও আরাকানে সক্রিয়ভাবে রোহিঙ্গাবিরোধী প্রচারণায় শামিল হয়েছে (Zin, 2014)। মিয়ানমারের মূলধারার নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোর যখন সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষা করার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল, তখনই তারা ব্যর্থ হয়েছে।

মিয়ানমারের নাগরিক সমাজ সরকারের নীতির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের তথাকথিত রাজনীতির উদারীকরণ সত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে যে নতুন 'শৃঙ্খলাবদ্ধ গণতন্ত্রের' অধীনে প্রথাগত নাগরিক সমাজের প্রতি রাষ্ট্রীয় নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। নাগরিক সমাজের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এই নাগরিক সমাজের অস্তিত্ব এবং কার্যক্রম ঠিক ততটুকুই, যতটুকু গ্যারিসন রাষ্ট্রে অনুমোদন দেওয়া হয়।

সে জন্য যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, এটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিরই ব্যর্থতা। তারাই মিয়ানমারে নাগরিক সমাজের ভূমিকা ব্যাহত করেছে (Zin, 2014)। নাগরিক সমাজ গোষ্ঠীগুলো মিয়ানমারে সামাজিক সেবা এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অনেক কাজ করে। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, তারা জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি গ্যারিসন রাষ্ট্রের দমনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সক্ষম হয়নি, বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি। তাই প্রশ্ন ওঠে, রোহিঙ্গাদের সার্বিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সেখানকার নাগরিক সমাজ কখনোই জোরালো আওয়াজ তুলতে সক্ষম হবে কি না।

রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধন চালানোর অপরাধে গাম্বিয়া ২০১৯ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মিয়ানমারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগনামা দাখিল করে। এই আদালতের শুনানিতে অং সান সু চির নেতৃত্বে বেশির ভাগ বেসামরিক ব্যক্তিদের একটি দল মিয়ানমার রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। তারা সবাই এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো খণ্ডন করার চেষ্টা করে। এই প্রতিনিধিদলের বক্তব্য মিয়ানমার রাষ্ট্রকে রক্ষা করার আড়ালে আসলে এই দেশটির তাতমাদোর অপরাধসমূহকে আড়াল করার চেষ্টা করে গেছে। উভয় পক্ষের শুনানির পর এই আদালত যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, তাতে স্বীকার করা হয়েছে যে মিয়ানমারে অবস্থিত ছয় লাখ রোহিঙ্গা মারাত্মক নিরাপত্তাঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মিয়ানমার সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া প্রতি ছয় মাস পর মিয়ানমার সরকারকে রাখাইনে রোহিঙ্গাদের অবস্থা বর্ণনা করে প্রতিবেদন পেশ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি সামরিক অভ্যুত্থানের কিছুদিন আগে ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি মিয়ানমার সরকার আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) এই মামলার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে তা বন্ধ করার অনুরোধ জানায়। ২০২১ সালের ২০ মের মধ্যে গাম্বিয়ার এই নারাজির প্রত্যুত্তরে মিয়ানমারকে তাদের মতামত আইসিজেকে জানাতে হবে। পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে সামরিক অভ্যুত্থানের কিছু পূর্বে নেওয়া এই পদক্ষেপ গ্যারিসন সংস্কৃতির পরিচায়ক এবং তা গণহত্যার দায়কে অস্বীকার শুধু নয়, তা অবহেলা করারও ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। এই পদক্ষেপ ও সামরিক অভ্যুত্থান-পরবর্তী মিয়ানমারের বর্তমান অবস্থা রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার বিষয়টিকে বিলম্বিত করবে।

এই আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে বহু বছর ধরে চলে আসা গ্যারিসন সংস্কৃতি মিয়ানমার রাষ্ট্রকে এক ভিন্নধর্মী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে—যেখানে রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনভাবে কাজ করার জায়গাটা সংকুচিত হয়ে গেছে। তাই মানবাধিকার লঙ্ঘন ও জাতিগত নিধন বা গণহত্যা এই রাষ্ট্রে সামরিকায়নকে চিরস্থায়ী করতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

পরিশেষে

অনেকে মনে করে থাকেন, ২০২১ সালে তাতমাদোর অভ্যুত্থানের ঘটনাটি এর প্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের ক্ষমতা দখলের ব্যক্তিগত লোভ থেকে সংঘটিত হয়ে যাওয়া একটি ঘটনা। তার নেতৃত্বে তাতমাদো রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ফলে তার ও তাতমাদোর অন্যান্য নেতৃস্থানীয় জেনারেলের ওপর মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আমলে নিয়ে আমেরিকাসহ বেশ কিছু দেশ তাদের আন্তর্জাতিক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তবে তাতমাদোর বিরুদ্ধে আনা অপরাধের অভিযোগ—তা সে রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো গণহত্যা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল—কোনোভাবেই ব্যক্তিপর্যায়ের স্বার্থ চরিতার্থ করার ফলাফল হিসেবে দেখার সুযোগ কম।

সামরিক বাহিনী বা তাতমাদোর ক্ষমতাকেন্দ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা গ্যারিসন সংস্কৃতির কাঠামোগত প্রভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এই প্রবন্ধে উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটিই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে একটি রাষ্ট্রকাঠামোয় যখন গ্যারিসন সংস্কৃতি প্রাধান্য পায়, তখন সামরিকায়নের ধারা খুব সফলভাবে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে যেতে থাকে এবং একসময় তা এত গভীরে প্রোথিত হয় যে সামরিক বাহিনী আর রাষ্ট্রের মধ্যে তখন পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে যায়। এ কারণে মিয়ানমারে বেসামরিক খাত বা সিভিল সোসাইটি থেকে রোহিঙ্গাদের জাতিগত নিধনের ব্যাপারে তেমন কোনো প্রতিবাদ দেখা যায় না। সামরিক অভ্যুত্থানের বিষয়ে একটি বড় অংশের প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে। তবে বর্তমানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে চলা বিক্ষোভে সাধারণ জনগণের ওপর যে নিপীড়ন চলছে, তাতে বেসামরিক জনগণ ও সিভিল সোসাইটির কিছুটা বোধোদয় হওয়া উচিত—যে অত্যাচার ও নির্যাতন গ্যারিসন রাষ্ট্রের সামরিক ও তাদের বশংবদ এলিট শ্রেণির ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার। তাতমাদো রোহিঙ্গাদেরকে বিভাজনের রাজনীতির মধ্য দিয়ে বাস্তুচ্যুত ও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যে নীলনকশা বাস্তবায়ন করছিল, আজ সেই বিভাজনের রাজনীতির আরেক ধরন আমরা দেখতে পাচ্ছি গণতন্ত্রের পক্ষে বিক্ষোভকারী জনগণকে অমানবিক নির্যাতন করার মাধ্যমে এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় শত্রু বানানোর মাধ্যমে।

এটি অনস্বীকার্য যে মিয়ানমারের রাজনীতিতে তাতমাদো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। শুধু রাজনীতি নয়, অর্থনীতি ও সমাজের সর্বস্তরে তাতমাদোর প্ররোচনা এবং মিয়ানমারকে একটি গ্যারিসন রাষ্ট্র হিসেবে এর প্রকৃতি ও কাঠামো বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এই বোঝাপড়া গবেষকদের জন্য পরবর্তী কাজগুলো করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। ২০১১ বা ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচন ও পরবর্তী সময়ের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার দৃশ্যত মিয়ানমারের রাষ্ট্রকাঠামোয় মৌলিক

কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। আর এই গ্যারিসন সংস্কৃতি তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধন পরিচালনা করেছে এবং বর্তমানে গণতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলন করা সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করছে। এই রাষ্ট্রকাঠামোকে পরিপূর্ণভাবে ভেঙে তাতে আমূল পরিবর্তন না করা পর্যন্ত এটা আশা করা অনুচিত হবে যে মিয়ানমারে একটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সু চিকে পুনরায় ক্ষমতায় বসাতে পারলে এই দেশটিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। অথবা, এটিও অনিশ্চিত যে এই গ্যারিসন রাষ্ট্রযন্ত্রে রোহিঙ্গাদের কোনোভাবে প্রত্যাবাসন করতে পারলে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই প্রশ্নগুলো মিয়ানমারের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং আন্তর্জাতিক সমাজের মধ্যে সবার ভূমিকা নিয়ে নতুন ভাবনার উদ্রেক করবে।

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত গ্যারিসন রাষ্ট্র ও 'national race' তৈরির ধারণাগুলো লেখকের ইংরেজিতে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে অনুপ্রাণিত। আরও ধারণা পেতে এই লেখা পড়া যেতে পারে : Niloy Ranjan Biswas (2019), 'Myanmar's military and the garrison state : State-military relations in Myanmar and their influence in the [re]production of violence against minorities', *Asian Journal of Comparative Politics*, Vol. 5, Issue 2, pp. 158-173. লেখক এই প্রবন্ধ তৈরিতে সার্বিক সহযোগিতা ও মতামত প্রদানের জন্য *প্রতিচিন্তা*র সহকারী সম্পাদক জনাব খলিলউল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ।]

তথ্যসূত্র

Ahmed I (2013) *Pakistan the Garrison State : Origins, Evolution, Consequences*, 1947-2011. Karachi : Oxford University Press.

Asian Human Rights Commission (AHRC) (2011) *Diagnosing the un-rule of law in Burma : A submission to the UN Human Rights Council's Universal Periodic Review*. Hong Kong : AHRC.

Brooten L and Verbruggen Y (2017) Producing the news : Reporting on Myanmar's Rohingya crisis. Journal of Contemporary Asia 47(3) : 440-460.

Bunte M (2011) *Burma's Transition to "Disciplined Democracy" : Abdication or Institutionalization of Military Rule?* GIGA Working Paper No. 177, August. Available at : https ://www.files.ethz.ch/isn/134189/wp177_buente.pdf (accessed 22 May 2018).

Bunte M (2014) Burma's transition to quasi-military rule : From rulers to guardians? Armed Forces & Society 40(4) : 742-756.

Callahan M (2001) Soldiers as state builders. In : Alagappa M (ed.) *Coercion*

and Governance : The Declining Political Role of the Military in Asia. Stanford, CA : Stanford University Press, p. 413-429.

Callahan M (2005) *Making Enemies : War and State Building in Burma*. Ithaca, NY : Cornell University Press.

Callahan M (2007) *Political Authority in Burma's Ethnic Minority States : Devolution, Occupation and Coexistence*. Washington, DC : East-West Center.

Chambers J and McCarthy G (2018) Introduction. In : Chambers J, McCarthy G and Farrelly N (eds) *Myanmar Transformed? People, Places and Politics*. Singapore : ISEAS-Yusof Ishak Institute, pp. 3-20.

Cheesman N (2017) How in Myanmar 'national races' came to surpass citizenship and exclude Rohingya. *Journal of Contemporary Asia* 47(3) : 461-483.

Egreteau R (2014) The continuing political salience of the military in post-SPDC Myanmar. In : Cheesman N, Farrelly N and Wilson T (eds) *Debating Democratisation in Myanmar*. Singapore : ISEAS-Yusof Ishak Institute, pp. 259-284.

Egreteau R (2017) *Parliamentary Development in Myanmar : An Overview of the Union Parliament, 2011-2016*. Myanmar : The Asia Foundation. Available at : https ://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/05/Parliamentary-Development-in-Myanmar_English.pdf (accessed 22 May 2018).

Farrelly N (2016) The NLD's iron-fisted gerontocracy. *Myanmar Times*, 1 February. Available at : https ://www.mmtimes.com/opinion/18759-the-nld-s-ironfistedgerontocracy.html (accessed 9 September 2019).

Furnivall JS (1991) *The Fashioning of the Leviathan : The Beginnings of British Rule in Burma*. Canberra : Department of Anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National University.

Green P (2018) Building a movement against genocide in Myanmar. *21st Century Global Dynamics* 10(58). Available at : http ://www.21global.ucsb.edu/global-e/september-2017/building-movement-against-genocide-myanmar (accessed 26 May 2018).

Green P, MacManus T and Venning A (2015) *Countdown to Annihilation : Genocide in Myanmar*. London : International State Crime Initiative, Queen Mary University.

Huntington SP (1957) *The Soldier and the State*. London : Oxford University Press.

Ibrahim A (2016) *The Rohingyas Inside Myanmar's Hidden Genocide*. London : C. Hurst & Co. Ltd.

Kyaw NN (2015) Alienation, discrimination and securitization : Legal personhood and cultural personhood of Muslims in Myanmar. *Review of Faith and International Affairs* 13(4) : 50-59.

Kyaw YH (2003) Reconsidering the failure of the Burma socialist program party government to eradicate internal economic impediments. *South East Asia Research* 11(1) : 5-58.

Kyaw YH (2007) *The State of the Pro-Democracy Movement in Authoritarian Burma*.Washington : East West Center.

Kyaw YH (2012) Understanding recent political changes in Myanmar. *Contemporary Southeast Asia* 34(2) : 197-216.

Lasswell HD (1941) The garrison state. *The American Journal of Sociology* 45(4) : 455-468.

McCarthy G (2019) *Military Capitalism in Myanmar : Examining the Origins, Continuties and Evolution of "Khaki Capital"*. Singapore : ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Macarthy S (2012) *Civil Society in Burma : From Military Rule to 'Disciplined Democracy'*. Regional Outlook Paper 37. Queensland : Griffith Asia Institute, Griffith University.

Mann M (1988) *States, War and Capitalism : Studies in Political Sociology*. Oxford : Blackwell.

Moses AD (2010) Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide. In : Bloxham D and Moses AD (eds) *The Oxford Handbook of Genocide Studies*. New York : Oxford University Press, 19-42.

Myoe MA (2009) *Building the Tatmadaw : Myanmar Armed Forces Since 1948*. Singapore : ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Myoe MA (2018) Partnership in politics : The Tatmadaw and the NLD in Myanmar since 2016. In : Chambers J, McCarthy G and Farrelly N (eds) *Myanmar Transformed? People, Places and Politics*. Singapore : ISEAS-Yusof Ishak Institute, pp. 201-230.

Nakanishi Y (2013) *Strong Soldiers, Failed Revolution : The State and Military in Burma, 1962-88*. Singapore : NUS Press and Kyoto University Press.

Paddock RC (2018) For Myanmar's army, ethnic bloodletting is key to power and riches. *The New York Times*, 27 January. Available at : https ://www. nytimes.com/2018/01/27/world/asia/myanmar-military-ethnic-cleansing.html (accessed 23 May 2018).

Paul TV (2014) *The Warrior State : Pakistan in the Contemporary World*. New York : Oxford University Press.

Seth A and Gallagher A (2018) What's in a name : Burma or Myanmar? A decision by the U.S. to accept the name Myanmar seems unlikely any time soon.

The Olive Branch, *USIP Blog*, 21 June. Available at : https ://www.usip.org/blog/ 2018/ 06/whats-name-burma-or-myanmar (accessed 5 September 2019).

Stanley J and Segal DR (1989) The garrison state. *Defense Analysis* 5(1) : 83-86.

Steinberg DI (2013) *Burma/Myanmar : What Everyone Needs to Know*. 2nd edn. New York : Oxford University Press.

Taylor R (2009) *The State in Myanmar*. Honolulu, HI : University of Hawaii Press.

United Nations, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 9 December 1948, United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277, available at : https ://www.refworld.org/docid/3ae6b3ac0.html (accessed 30 March 2021)

Walton M (2013) The 'wages of Burman-ness' : Ethnicity and Burman privilege in contemporary Myanmar. *Journal of Contemporary Asia* 43(1) : 1-27.

Xu B and Albert E (2016) *Understanding Myanmar*. Council for Foreign Relations Backgrounder. Available at : https ://www.cfr.org/backgrounder/understanding-myanmar (accessed 2 June 2018).

Zarni M and Cowley A (2014) The slow-burning genocide of Myanmar's Rohingya. *Pacific Rim Law and Policy Journal* 23(3) : 681-752.

Zin M (2014) Can Burma's civil society find its voice again? *Transitions*, 26 November. Available at : http ://foreignpolicy.com/2014/11/26/can-burmas-civil-society-find-its-voice-again/ (accessed 26 May 2018).

সমাজ

‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ এবং বাংলায় ইসলাম প্রসারের তরবারিতত্ত্ব

আলতাফ পারভেজ

ভূমিকা

আল মাহমুদ আমার প্রিয় কবিদের একজন। তাঁর অনেক কবিতা বারবার পড়ি। নতুন করে মুগ্ধ হই। কেবল বহুল আলোচিত ‘সোনালী কাবিন’ নয়, তাঁর অনেক কবিতাই অমরত্ব পাবে বলে অনুমান করা যায়। তাঁর ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ও অনেক জনপ্রিয়। বহুল পঠিত।

‘বখতিয়ারের ঘোড়া’য় বঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের কিছু চুম্বক ইঙ্গিত আছে। কাব্যিক ব্যবহারে তা অনন্য। কিন্তু ইতিহাস-চৈতন্যের দিক থেকে তা কোনো ভুল বার্তা দেয় কি না, সে প্রশ্ন তোলা যায়। ইতিহাসস্পর্শী কবিতা সে প্রশ্ন এড়াতে পারে না। কবিতার তাফসিরে সবাই একমত হন না। সেটা মেনেই ওই রকম প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এখানে।

কবিতা বহুকাল ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের অন্যতম উৎস। ‘হিস্ট্রিক্যাল পোয়েট্রি’ বলে কবিতার একটা সুপরিচিত ধারাই রয়েছে; যা ইতিহাস ও সমাজ গবেষণায় বহু আলোচিত উৎস। যে কারণে ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতার ওপর দাঁড়িয়ে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ইতিহাস লিখিত হয়। যেভাবে উর্দুতে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কবিতায় ১৯৪৭-এর দেশভাগ কিংবা বাংলা ভাষায় শামসুর রাহমানের কবিতায় ১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধকে পাই আমরা। অর্থাৎ কাব্য সুষমার বাইরেও কবিতা নিয়ে আলাপ উঠতে পারে। কবিতায় প্রকাশিত ঐতিহাসিক বিবরণে লুকিয়ে থাকা আকার-ইঙ্গিতে বাড়তি অনুসন্ধান হতে পারে; যা আবার কবিতা-সাহিত্যের শক্তির জায়গাই প্রকাশ করে। ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’কে আমরা সেভাবেও পাঠ করতে পারি। ব্যক্তি ও কবি আল মাহমুদকে একদম মিলিয়ে না ফেলেও সে পাঠ চলতে পারে।[১]

এ কবিতায় 'ঘোড়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ধরে নেওয়া যায় বখতিয়ার খলজির বীরত্ব, সাহস এবং স্থানীয় সমাজের সমর্থনের প্রতীক ও প্রমাণ হিসেবে। কবি স্পষ্টত বখতিয়ারকে মহিমান্বিত করেন। সেই মহিমার সঙ্গে পরোক্ষে যুক্ত করতে চান বঙ্গে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ায় ওই যোদ্ধার 'অবদান'-এর গৌরব। বখতিয়ারের ঘোড়ায় কবি পাঠককে ধর্মীয় আবেগে উদ্দীপ্ত করতেও আকুল, যে পাঠক স্থানীয় পর্যায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠই হয়তো ধর্মে মুসলমান। এমনকি পাঠকের ধর্মীয় পরিচয় বাদ দিয়েও বলা যায় বখতিয়ারের ঘোড়া বাংলায় ইসলামের প্রসার সম্পর্কে ধারণা দিতে চায়। কিন্তু সেই ধারণার যথার্থতা মোটা দাগে খতিয়ে দেখা জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ, এই কবিতার সরল পাঠ নবীন পাঠকের মধ্যে এই বোধ তৈরি করে যে 'ঘোড়ার ক্ষুর' আর মধ্য এশিয়ার 'যোদ্ধাদের তরবারি'র ডগায় ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছে এখানে। বাংলার ইসলাম যেন শুধুই একটা যুদ্ধ-প্রসঙ্গ।

এ রকম বিবরণ কেবল আল মাহমুদের ৩৩ লাইনের ১৮৬ শব্দের এই কবিতায় রয়েছে, তা-ই নয়। বাংলাদেশে 'ইসলামের ইতিহাস' নামে যা কিছু প্রচলিত ও প্রচারিত, তাতে এটা এক প্রবল বয়ান আকারে আছে।[২] এই ধর্মীয়-সমরবাদ গৌরবের সঙ্গেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম লিখিত-পঠিত-প্রচারিত হচ্ছে। যেমন বাংলাদেশে কলেজ পর্যায়ে ইতিহাসের বহুল প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আব্দুল করিমের *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসন*। খুবই প্রভাবশালী গ্রন্থ এটা। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী এ রকম বই পড়ে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে জানছে। পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি নিচ্ছে। অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থের। এই বইয়ে 'বিচক্ষণ সমরনায়ক' বখতিয়ারকে 'বাংলা জয়' এবং 'ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়েম'-এর কর্তৃত্ব দেওয়া আছে।[৩] এ রকম গ্রন্থের বাইরে সরাসরি শুধু বখতিয়ার খলজির ওপরও অনেক বই লেখা হচ্ছে। যেমন সরদার আব্দুর রহমান লিখেছেন (তাঁর উল্লেখ মতে), *বখতিয়ার খলজির পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ*। সেখানে বখতিয়ারকে নিয়ে বলা হয়েছে, 'পুরাতন ধর্মের নিগড় থেকে নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করার এবং একটা নতুন জীবনব্যবস্থায় উত্তীর্ণ করার জন্য তিনি প্রথম বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্যোগ নেন।...বাংলাদেশের প্রথম দীক্ষিত মুসলমান দেবকোটের কোচদলপতি... আলীমেচ তাঁরই আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সদলবলে মুসলমান হয়।...বিজয়ী ধর্ম হিসেবে তাঁর (বখতিয়ারের) দ্বারাই এতদঞ্চলে প্রথম ইসলাম প্রচার শুরু।'[৪]

ইতিহাস হিসেবে এই সব ভাষ্য কতটা সঠিক, তা বাড়তি বিবেচনা দাবি করে। এসব বিবরণের সত্যাসত্য এবং তার পক্ষে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি না এবং বঙ্গে প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের আহ্বান কীভাবে প্রচারিত হয়েছে, সেসব নিয়ে আমরা ধাপে ধাপে পর্যালোচনা করব। বাংলায় বিশ্বাস হিসেবে ইসলামের প্রসার কি শুধু বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঘটেছে, নাকি এর অর্থনৈতিক সামাজিক

আধ্যাত্মিক অনেক কারণ ছিল, সেসবও খতিয়ে দেখা দরকার। ইসলাম আবির্ভাবের তরবারি ও ঘোড়াতত্ত্ব বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই ধর্ম প্রসারের যে ধারণা প্রচার করে, তার মাধ্যমে আসলে অপর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য আড়াল হচ্ছে কি না, সেটাও আমাদের পর্যালোচনায় থাকবে।

বাংলায় ইসলামের আবির্ভাবের প্রাথমিক দিনগুলো নিয়ে ইতিমধ্যে কিছু মৌলিক গবেষণা হয়েছে। আরও হবে নিশ্চয়ই। তবে এ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষণার সারকথা হচ্ছে, এখানে ইসলামের প্রসার ও বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ, মানুষের মনোজগৎ এবং প্রত্যক্ষ কিছু সমাজ-ঘটনা বিপুল ভূমিকা রেখেছে। তবে 'বখতিয়ারের ঘোড়া' আমাদের সামনে তার বিপরীত প্রতিচ্ছবি নিয়ে হাজির হয় এবং লোকপ্রিয়তা পায়। এটা কবিতাশিল্পের জন্য ভালো খবর। কিন্তু ইসলাম ও ইতিহাসের দিক থেকে একে যাচাই করে নেওয়া জরুরি।

কারণ, এ রকম বিবরণ ইসলাম সম্পর্কে ভীতিকর ধারণার দিকেও নিয়ে যায় পাঠককে। পাশাপাশি ইসলামের কাঁধে সওয়ার হয় ভারতবর্ষে মধ্য এশিয়ার যোদ্ধাদের নানান নির্মমতার কাণ্ডকৃর্তি। সেসব নির্মমতার কলঙ্ক বাড়ানো-কমানোর একটা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতাও আছে। তাতে করে বিভিন্ন তরফে আবার অস্পষ্ট ও অযৌক্তিক নতুন নতুন বিবরণ হাজির হয়ে চলেছে; যা তৎকালীন বঙ্গসমাজ সম্পর্কে পাঠককে ঐতিহাসিক সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে ব্যর্থ করে দেয়। এ রকম এক পরিসরে দাঁড়িয়ে আমরা 'বখতিয়ারের ঘোড়া' পুনঃপাঠ করছি। তবে এ-ও বলা দরকার, আল মাহমুদের কবিতা ও তাঁর ইতিহাসচেতনা এই আলোচনায় একরূপ উপলক্ষমাত্র। এই আলোচনা কেবল বাংলার ইতিহাসে ইসলাম আবির্ভাবের তরবারিতত্ত্বকে পর্যালোচনা করতে ইচ্ছুক। তবে পাশাপাশি এসব প্রশ্নও তোলা হচ্ছে—বাংলার আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে বাইরে থেকে আসা আক্রমণের মাধ্যমে রাজত্ব করা শাসকদের আমরা কীভাবে দেখব। বাংলার ইতিহাস বলতে আমরা আসলে কার বিবরণকে বুঝব। আগ্রাসী শাসকদের ইতিহাস, নাকি স্থানীয় প্রাকৃতজনের জীবন-জীবিকা-নির্মাণ-ধ্বংস-দুঃখ-সুখের বিবরণ? হয়তো দুটোই। কিন্তু কোনটা অগ্রাধিকার পাবে?

আবেগ, বর্ণ, ধর্ম ও জাতিগত পক্ষপাতের বাইরে এসে অতীত বাংলা নিয়ে যেসব নির্ভরযোগ্য গবেষণা রয়েছে, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই আলোচনা। তবে মূল বিতর্কে প্রবেশের আগে আলোচিত কবিতাটি আমরা আরেকবার পড়ে নিতে পারি :

বখতিয়ারের ঘোড়া

মাঝে মাঝে হৃদয় যুদ্ধের জন্য হাহাকার করে ওঠে
মনে হয় রক্তই সমাধান, বারুদই অন্তিম তৃপ্তি;
আমি তখন স্বপ্নের ভেতর জেহাদ, জেহাদ বলে জেগে উঠি।
জেগেই দেখি কৈশোর আমাকে ঘিরে ধরেছে।

যেন বালিশে মাথা রাখতে চায় না এ বালক,
যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে মশারি,
মাতৃস্তনের পাশে দু'চোখ কচলে উঠে দাঁড়াবে এখুনি;
বাইরে তার ঘোড়া অস্থির, বাতাসে কেশর কাঁপছে।
আর সময়ের গতির ওপর লাফিয়ে উঠেছে সে।

না, এখনও সে শিশু। মা তাকে ছেলে ভোলানো ছড়া শোনায়।
বলে, বালিশে মাথা রাখো তো বেটা। শোনো
বখতিয়ারের ঘোড়া আসছে।
আসছে আমাদের সতেরো সোয়ারি
হাতে নাংগা তলোয়ার।

মায়ের ছড়াগানে কৌতূহলী কানপাতে বালিশে
নিজের দিলের শব্দ বালিশের সিনার ভিতর।
সে ভাবে সে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়দৌড়। বলে, কে মা বখতিয়ার?
আমি বখতিয়ারের ঘোড়া দেখবো।

মা পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে হাসেন,
আল্লার সেপাই তিনি, দুঃখীদের রাজা।
যেখানে আজান দিতে ভয় পান মোমেনেরা,
আর মানুষ করে মানুষের পূজা,
সেখানেই আসেন তিনি। খিলজীদের শাদা ঘোড়ার সোয়ারি।
দ্যাখো দ্যাখো জালিম পালায় খিড়কি দিয়ে
দ্যাখো, দ্যাখো।
মায়ের কেচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক
তুলোর ভেতর অশ্বখুরের শব্দে স্বপ্ন তার
নিশেন ওড়ায়।

কোথায় সে বালক?

আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা
মনে হয় রক্তেই ফয়সালা।
বারুদই বিচারক। আর
স্বপ্নের ভেতর জেহাদ, জেহাদ বলে জেগে ওঠা।

বখতিয়ার খলজির বাংলায় আসা

বখতিয়ার খলজি বাংলায় অভিযান চালান ১২০৪ সালে (হিজরি ৫৯৮-৯৯; কোনো কোনো ভাষ্যকারের মতে ১২০৫ সালে) এবং সেটা বাংলার ক্ষুদ্র একাংশে মাত্র।[৫] বিহার-নদীয়া-গৌড় ছিল তাঁর অভিযানের পথরেখা, যা ইতিহাসের বইগুলোতে 'লক্ষ্মণাবতী' নামেও পরিচিত। রাজা লক্ষ্মণের নামে গৌড়ের ওই নামকরণ। ইসলাম ধর্মের অনুসারী শাসকদের আমলে লক্ষ্মণাবতীকে 'লাখনৌতি' নামে উল্লেখ শুরু হয়।

গৌড় অভিযানের দুই বছর পরই আসাম-তিব্বত অভিযানে খলজি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তখন নিজ পক্ষীয় আরেক সেনাপাতি কর্তৃক ছুরিকাহত হয়ে মারা যান তিনি। তাঁর জন্ম-মৃত্যু-সামরিক কর্মকাণ্ডের দিন-তারিখে সামান্য হেরফের আছে পুরোনো বিবরণে। সেই বিতর্ক এড়িয়ে আমরা মূল প্রসঙ্গের দিকে এগোব।

বখতিয়ার খলজির অধিকাংশ বিবরণের উৎস কাযী মিনহাজ-ই সিরাজ জোযজানীর *তবকাত-ই-নাসিরী*। বাংলায় মুসলমান শাসনের অনেক তথ্যের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বাংলায় মুসলমানদের অভিযান সম্পর্কে এটাকে প্রাচীন প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এ-ও মনে রাখা দরকার, এটি বখতিয়ারের মৃত্যুর প্রায় ছয় দশক পর প্রকাশিত এবং চার দশক পরের শোনা কথার ওপর লিখিত। লেখকের জন্ম বখতিয়ারের বাংলা অভিযানের এক দশক আগে। আর তিনি হিন্দুস্তানে এসেছেন বখতিয়ারের মৃত্যুর অন্তত দুই দশক পর, তা-ও বাংলা থেকে বহু দূরের সিন্ধুতে। বখতিয়ারের অভিযান সম্পর্কে তাঁর কোনো সরাসরি অভিজ্ঞতা ছিল না। দিল্লিতে কাযী থাকা অবস্থায় ওই গ্রন্থ লিখিত এবং এর ভিত্তি হলো ১২৪২ সালের পর দুই বছর বাংলায় অবস্থান। ১২৬০ সালের অক্টোবরে মিনহাজ-ই-সিরাজ এটা লেখা শেষ করেন। মেজর রেভার্টি পরে সেটা অনুবাদ করেন, যা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে।

মিনহাজ-ই-সিরাজ নিজে দিল্লির মুসলমান শাসকদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক সামরিক অভিযানেও অংশ নেন।[৬] গ্রন্থটি লেখা হয়েছে দিল্লির ১২৪৬ সালের শাসক সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহর জন্য পুরস্কার হিসেবে। 'তবকত' মানে কাহিনি। 'তবকাত' হলো তার বহুবচন। 'তবকাত-ই-নাসিরী' মানে 'সুলতান নাসিরের কাহিনী'। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে এখানে তিনটি তবকতে (২০, ২১, ২২) উল্লেখ আছে।

এ গ্রন্থ স্বাভাবিকভাবেই শাসকদের বিষয়ে প্রশংসামূলক ছিল। কারণ, সরাসরি তাদের ছত্রচ্ছায়ায়, তাদের গুণগান হিসেবে এটা লিখিত। এ রকম একমাত্র উৎসকে ব্যবহার করে বখতিয়ার খলজির যেসব বীরত্বের বিবরণ প্রচারিত হয়, তা সংগত কারণেই প্রশ্নসাপেক্ষ। বীরত্বের পাশাপাশি মিনহাজও বখতিয়ারকে 'অধিকৃত অঞ্চলসমূহে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপাসনালয় নির্মাণ' করার কৃতিত্ব দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত বখতিয়ারের আমলের সে রকম কোনো স্থাপত্য কোথাও না পাওয়ার পরও এসব

বিবরণ সদম্ভে জারি আছে। এসব নিয়ে বাড়তি অনুসন্ধান বেশি হয়নি; বরং পরবর্তী 'ইতিহাসবিদ'রা সিরাজের বিবরণকেই নানানভাবে পুনর্লিখন করে চলেছেন। আবার *তবকাত-ই-নাসিরী* থেকে বখতিয়ারের বিষয়ে যত তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়, তার 'প্রতিপক্ষ' লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে তেমনটি করা হয় না। বাংলায় তখনকার জনসাধারণ সম্পর্কেও সেখানে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না।

তবকাত-ই-নাসিরী বা অনুরূপ কোনো উৎস আমাদের এমন কোনো তথ্য দেয় না, যা থেকে বখতিয়ারের জীবনের প্রথমাংশে এমন সাক্ষ্য মেলে যে ধর্মপ্রচার তাঁর কোনো লক্ষ্য ছিল। আধ্যাত্মিকতার দিকে এই যোদ্ধার আগ্রহ ছিল বলে বিস্তারিত প্রমাণ মেলে না; বরং প্রাথমিক সমর অভিযানগুলোতে সম্পদ-সংগ্রহ এবং সৈন্যদল বাড়াতেই তাঁকে আগ্রহী দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে জায়গির পাওয়া (বর্তমানের উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার) ভিউলী ও ভগবাত থেকে তিনি আশপাশের হিন্দু শাসকদের রাজ্যগুলোতে মাঝে মাঝে বছরাধিক কালজুড়ে যেসব অভিযান চালিয়েছেন, সেসব মূলত সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে। বিহারের (মগধ) ওদন্তপুরী বিহার আক্রমণের পর বখতিয়ার খলজি সেখানকার ধনসম্পদ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। ধর্মের প্রসার যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে, তিনি কোথাও অভিযান শেষে ধনসম্পদ সংগ্রহ শেষে সেখান থেকে চলে যাবেন, এমনটি হওয়ার কথা নয়। *তবকাত-ই-নাসিরী*তে লেখা রয়েছে, 'বিজয় লাভের পর (ওদন্তপুরী বিহার দখলের পর) লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রত্যাবর্তন করেন ও সুলতান কুতুব-উদ-দীনের কাছে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে প্রভূত সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন।'[৭] ওদন্তপুরী থেকে সংগৃহীত সম্পদ যে তখনকার দিল্লির 'সুলতান' কুতুব-উদ-দীন আইবককে উপহার দেওয়া হয়, সে বিষয়ে গবেষক মোহাম্মদ মোহার আলীও উল্লেখ করেন, যদিও তিনি এটা মানেননি যে ওই অভিযানে বখতিয়ার কাউকে খুন করেন।[৮]

আল-বেরুনীর *কিতাবুল হিন্দ* সাক্ষ্য দেয়, ওই সময়ের ভারতীয় হিন্দু রাজ্যগুলোতে মন্দিরে প্রচুর ধন-সম্পদ গচ্ছিত থাকত; যা ওই সব রাজ্যে বহিরাক্রমণের বড় কারণ ছিল। বখতিয়ার খলজির সৈন্য দলও গড়ে উঠেছিল ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধাদের দ্বারা। ধর্মপ্রচারক বা আধ্যাত্মিকতার তাড়নাদীপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা নয়। এরা কেউ শাহ সুলতান রুমি, আমানত শাহ, মিসকিন শাহ বা বায়েজিদ বোস্তামীর মতো ছিলেন না। এঁরা জিহাদে লিপ্ত হয়েছিলেন বলেও প্রমাণ নেই। আমাদের প্রিয় কবি আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় জিহাদ ও বখতিয়ার খলজি প্রায় সমার্থক করেছেন এবং তুর্কি এই যোদ্ধাকে 'আল্লার সেপাই' বলেছেন। ফলে ইসলামের একরূপ কট্টর ও সমরবাদী যে ইমেজ দাঁড়ায়, তা বঙ্গে ইসলামের আবির্ভাবের সময়ের সঙ্গে মেলে কি না, তা একটু পর আমরা মিলিয়ে দেখব। আমরা এ-ও দেখব যে 'জিহাদ' অর্থ যদি 'ধর্মযুদ্ধ' হয়, তাহলে তখনকার বাংলার সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির[৯] মাঝে সেটার প্রয়োজন বা অবকাশ

ঘটেনি। শাসকদের সঙ্গে শাসকদের ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং জিহাদ মোটেই সমার্থক নয়। ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক—কোনো বিবেচনা থেকেই নয়; বিশেষ করে যেখানে উভয় শাসকই বহিরাগত।

'বখতিয়ারের ঘোড়া' কবিতাটির অনন্য কাব্যিক সৌন্দর্য রয়েছে। কিন্তু তাতে এমন এক ব্যক্তিকে বাংলায় ইসলাম প্রচারের গৌরবের ভাগ দেওয়া হচ্ছে বা প্রধান এক ইসলাম-পসন্দ ব্যক্তির তকমা দেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবতার সঙ্গে সামান্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআনে জিহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই জন্য, যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে ও ধৈর্য ধারণ করে' (১৬ সুরা নাহল : ১১০)। অর্থাৎ জিহাদ বা অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হলো নির্যাতনের একরূপ প্রত্যুত্তর। কিন্তু বখতিয়ার খলজি কোথাও নির্যাতিত নন। বরং পেশাগত জীবনের শুরুতে তিনি দিল্লিসহ বিভিন্ন স্থানের মুসলমান শাসকদের দ্বারাই কয়েকবার প্রত্যাখ্যাত। তিনি মগধ বা নদীয়া কিংবা গৌড়ে কোনো পূর্ব নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আসেননি। তাঁর সর্বশেষ তিব্বত অভিযানকেও জিহাদ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এগুলো সাম্রাজ্য বিস্তার, সম্পদ সংগ্রহ এবং রাজত্ব কায়েম ছাড়া আর কিছু ছিল না।

বাস্তবে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দ্বারা ইতিমধ্যে এ সত্য সমর্থিত হয়—বখতিয়ার খলজির বহু আগেই বঙ্গে ইসলামের প্রচার ঘটে গিয়েছিল। তবে এর প্রসার তখনো বাকি ছিল। তুর্কি যোদ্ধাদের যদি এখানে ধর্মপ্রচারের কর্তৃত্ব দিতে হয়, তাহলে বখতিয়ারের আগে প্রায় ৫০০ বছরজুড়ে উপমহাদেশে আগত ইসলাম প্রচারকারীদের সেটা কেন দেওয়া হবে না? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তারাই বরং ধর্ম প্রচারে প্রাথমিক প্রতিকূলতা অতিক্রমের কৃতিত্বের অধিকারী।

অন্যদিকে যদি রাজা-বাদশাহদের দ্বারা বা তাঁদের তরবারি শক্তিতে ধর্মান্তরকরণ গতি পেত, তাহলে উপমহাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকত দিল্লিতে। কয়েক শতাব্দী ওখানে মুসলমান শাসকদের কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও তেমনটি ঘটেনি; বরং দিল্লির নগর পরিমণ্ডলে মুসলমান জনসংখ্যার বড় অংশ ছিল বাইরে থেকে আগতরা বা তাদের বংশধরেরা। বাংলাতেও মুসলমান শাসকদের অবস্থানের মূল জায়গাগুলোতে নয়, ইসলামের বেশি বিকাশ ঘটেছে প্রান্তিক অঞ্চলে।

১৮৭১ সালে ভারতে প্রথম জনশুমারি হয় বলে আমরা জানি। তবে তার আগেও কিছু কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে শুমারি হয়েছে।[১০] সেই সূত্রে পাওয়া যায়, নদীয়ার ১৮০১ সালের জনসংখ্যার হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সেখানে তখনও মুসলমানদের হিস্যা ৩৭ দশমিক ৫ ভাগ। দারিদ্র্যের কারণে মুসলমানদের জন্মহার বেশি হওয়া সত্ত্বেও ১৮০১ সালে নদীয়ায় মুসলমানরা ছিল অমুসলমানদের (৫৪ শতাংশ) চেয়ে প্রায় ১৭ শতাংশ কম। অথচ এই নদীয়া 'জয় করে'ই বখতিয়ার বাংলায় ইসলাম প্রসারের খ্যাতি উপভোগ করে যাচ্ছেন। এবং তারপরও বহুকাল সেখানে মুসলমানদের 'শাসন' ছিল।

পরিসংখ্যান এখানে 'তরবারির শক্তি' ও ব্যবহার সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা দেয় না; বরং ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে আমরা যা পাই, দিল্লিতে মুসলমান শাসকদের প্রতিষ্ঠার বহু আগে বাংলায় আরবদের আগমন ঘটে গিয়েছিল। বখতিয়ারের আগমনের কয়েক শ বছর আগের মসজিদের প্রমাণ রয়েছে বাংলায়। ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের আগের আরবি মুদ্রা পাওয়ার নজির আছে রাজশাহীর পাহাড়পুর[১] ও কুমিল্লার ময়নামতিতে। বখতিয়ারের আগমনের আগে বা সমকালে মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে এসেছেন বাবা শহীদ আদম, নেত্রকোনার মদনপুরে এসেছেন শাহ সুলতান রুমি, বগুড়ার মহাস্থানে এসেছেন সুলতান মাহিসওয়ার ('মাছের পিঠে আরোহণকারী' বলে কথিত), সিরাজগঞ্জে এসেছেন ইয়েমেনের মখদুহ শাহ দৌলা প্রমুখ। এ রকম তালিকা আসলে আরও অনেক দীর্ঘ। মুন্সিগঞ্জের রামপালের মতো একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেন আমলে বাবা আদমের উপস্থিতির কাহিনি নিশ্চিতভাবে আমাদের বঙ্গে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বার্তা দেয়।

এটা হতে পারে, বখতিয়ার অভিযানের পর বাংলার কিছু অংশে ইসলামের অবকাঠামোগত বিকাশ গতি পেয়েছিল। পুরোনো সমাজের গর্ভে নতুনের জন্মের যে তাড়না ছিল, পুরোনো শাসকের অপসারণে তা-ই স্বচ্ছন্দ হয়েছে। এটা নতুন চলমানতার সঞ্চার করতে বাধ্য। পাশাপাশি এ-ও সত্য, বাংলায় বাইরে থেকে অভিযানে আসা মুসলমান ধর্মাবলম্বী প্রথম সেনানায়ক বখতিয়ার। কিন্তু যে ধর্মাবলম্বীই হোন, তিনি কিন্তু যোদ্ধা এবং পররাজ্য আক্রমণকারীই। লস্কর-ই-তুরকান (তুর্কিদের সেনাবাহিনী) আর লস্কর-ই-ইসলাম (ইসলামের সেনাবাহিনী) এক বিষয় হতে পারে না।[২] উপরন্তু রক্ত ও ভাষাগত দিক থেকে স্থানীয় জনপদের সঙ্গে কোনো রূপ সম্পর্ক ছিল না এই যোদ্ধাদের। বখতিয়ারের মুসলমানিত্বকে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সঙ্গে একাকার করে ভাবা কিংবা একজন মুসলমানের 'শাসন'কে 'ইসলাম কায়েম' হিসেবে দেখার আগে বাংলাভাষীদের কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি :

ক] বখতিয়ারের আগমনের বহু আগেই ইয়েমেন, মক্কা, বাগদাদ ইত্যাদি স্থান থেকে দরবেশ ও আউলিয়ারা এখানে এসেছেন;

খ] বখতিয়ার নিজে বাংলার সামান্য অংশেই অভিযান পরিচালনা করেন; সুতরাং পুরো বাংলায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকা রাখার সুযোগ খুবই সীমিত; এটা কেবল ভৌগোলিক কারণেই নয়, সময়গত কারণেও। বাংলা অভিযানের দুই বছর পরই তিনি মারা যান। ফলে এত অল্প সময়ে ব্যাপক কোনো ধর্মীয় জাগরণের অবকাশ প্রশ্নসাপেক্ষ। পরের আলোচনায় বিভিন্ন গবেষকের বিবরণ থেকে আমরা দেখব, বাংলায় কখনোই মুসলমানদের সংখ্যা হঠাৎ একসঙ্গে বাড়েনি; বরং বহু বছর ধরে দরবেশদের ধীরলয়ের ভূমিকায় এখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের রূপান্তর ঘটেছে।

গ] প্রাথমিক জীবনের বিবরণ থেকে বখতিয়ারের মাঝে ধর্মপ্রচারকের কোনো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষ্য পাওয়া যায় না; তিনি যদি সেই কাজই করতেন, তাহলে বাংলায় আসার আগে তাঁর জায়গির পাওয়া বিউলি ও ভাগবাতে তার স্পষ্ট নজির থাকত।

ঘ] বখতিয়ারের বীরত্ব সম্পর্কে ব্যাপক অতিকথন দেখা যায়; অথচ তাঁর যোদ্ধা জীবনের বড় অভিযানে (১২০৫ সালের পর কামরূপ-আসাম-তিব্বত অভিমুখীন) তাঁর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিতই হয়েছিল। এমনকি বিহার অভিযান শেষেও মিথিলা (উত্তর বিহার) তাঁর দখলে আসেনি।[১৩] কামরূপে এমন এক রাজার কাছে তিনি পরাজিত হন, যার যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ কোনো খ্যাতি ছিল না। এই যুদ্ধে কামরূপে বন্দি হয়ে থাকা বখতিয়ারের যোদ্ধাদের বংশধরেরাই আসামের ইতিহাসে 'গোরিয়া মুসলমান' হিসেবে কথিত। মিনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণ থেকেই জানা যায়, তিব্বত অভিযানে যেসব সৈন্য নিহত হয়েছিল, তাদের বিধবা স্ত্রী ও এতিম শিশুরা বখতিয়ারকে পেলেই অভিসম্পাত বর্ষণ করত। মিনহাজ-ই-সিরাজের সেই বিবরণ এ রকম :

> বখতিয়ার দেওকোটে পৌঁছে অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। যেসব খলজি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন, তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার লজ্জায় তিনি অশ্বারোহণ করতেন না। যখনই তিনি অশ্বারোহণ করে বের হতেন, গৃহচূড়া ও রাস্তা থেকে সমুদয় লোক অভিযোগ করতেন এবং অভিশাপ দিতেন। গালিগালাজ করতেন।[১৪]

এই হলো বাস্তবে বীর বখতিয়ারের অবস্থা। মিনহাজের বিবরণ থেকে এ-ও লক্ষণীয় যে এসব অভিযান ছিল 'খলজি' উপজাতিদের একটা ব্যাপার। তিব্বত অভিযানের এই পরিণতির আগে নদীয়া দখলেও কোনো যুদ্ধ হয়নি লক্ষ্মণ সেনের পালিয়ে যাওয়ার বিবরণ সঠিক হলে। লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়েও বখতিয়ার যুদ্ধ করার মতো কোনো প্রতিপক্ষ পেয়েছেন বলে জানা যায় না। অথচ বাংলার ইতিহাসগ্রন্থসমূহ তাঁর বীরত্বে ভারাক্রান্ত।

ঙ] বাংলার যে অংশ বখতিয়ারের দখলকৃত ছিল, সেখানে তাঁর পরের শাসক শিরান খলজিও দ্রুতই উৎখাত হয়েছিলেন। মাত্র আট মাস তিনি রাজত্ব করেন। ১২০৮ সালে তিনিও পলাতক অবস্থায় মারা যান। এই দুই খলজি যদি স্থানীয় সমাজে জনপ্রিয় হতেন, তাহলে শিরানের এত দ্রুত অপসারণ নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না।

চ] খলজিরা বাংলার নদীয়া বা গৌড়কেন্দ্রিক যে অংশ দখল করেছিলেন তার বাইরে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় সেন বংশের শাসন আরও দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। আমাদের ইতিহাস বইগুলোতে যদিও লেখা হয়, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন বঙ্গে সেন বংশের 'শেষ রাজা' নন মোটেই। তাঁর দুই পুত্র (বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন) বহু বছর বাংলার বড় এক অংশ শাসন করেছেন। বিভিন্ন তাম্রশাসনে ইতিমধ্যে প্রমাণিত, লক্ষ্মণ সেনের এই দুই পুত্র ১২২৩ সাল পর্যন্ত বিক্রমপুরে শাসক ছিলেন। অর্থাৎ

বখতিয়ারের আক্রমণে 'বাংলায় মুসলমান শাসন কায়েমে'র দাবি ঐতিহাসিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। বখতিয়ারের নদীয়া ও গৌড় (বর্তমানের মালদহ) বিজয়কে 'বাংলা বিজয়' হিসেবে ইতিহাস বইগুলো যেভাবে উল্লেখ করে, তা খুবই বিভ্রান্তিকর।[১৫] এমনকি এরপরের সুলতানি শাসন শুরু হতেও অনেক দশক লেগেছে। আবার সুলতানি শাসনের মাঝেও বাংলায় কংশনারায়ণ নামে অমুসলমান স্বাধীন রাজা ক্ষমতায় এসেছেন (১৪১৭ সালে)। ইতিহাসকে নির্মোহভাবে পাঠ করতে হলে এসব তথ্য অবজ্ঞা করা যাবে না।

ছ] বাংলায় ইসলামের বিকাশকে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই খলজিদের মতো যোদ্ধা দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে পর্যবেক্ষণের আরেকটা বিপদের দিক হলো, এতে ধরে নেওয়া হয়, এই ধর্ম তার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সামর্থ্যের ওপর দাঁড়িয়ে তলোয়ার বা রাষ্ট্রীয় মদদ ছাড়া প্রচারিত ও বিকশিত হতে সক্ষম নয়। এটা এক অর্থে ইসলামকে 'রিলিজিয়ন অব সোর্ড' বলে যেভাবে খণ্ডিত প্রচার রয়েছে, তাকে মেনে নেওয়া। বাংলায় ইসলামের ইতিহাস নিয়ে খ্যাতনামা গবেষকদের ভাষ্যগুলোর সঙ্গে এ রকম পর্যবেক্ষণ একদম মেলে না। এমনকি জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআনসম্মতও নয় (২ : ২৫৬)।

জ] মিনহাজ-ই-সিরাজ যদিও বলেছেন, নদীয়া ও গৌড়ে অভিযান শেষে 'বখতিয়ার খলজি অনেক মসজিদ, খানকা ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন' কিন্তু তার ন্যূনতম কোনো অবশেষ চিহ্নের কথা প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপে পাওয়া যায় না। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় ১২৩১ সালের আগের কোনো স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ বা শিলালিপির কথা এখনো জানা যায় না, যা থেকে এ স্থানকে সেকালের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র বলে মনে হতে পারে। গৌড়ে পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন শিলালিপিটি ১২৩১ সালের, যা একটা কূপ খননের ফলক।[১৬] তা ছাড়া যদি মিনহাজ-ই-সিরাজের এই বিবরণকে সত্য মানতে হয়, তাহলে এ-ও মানতে হয়, 'অনেক মসজিদ' স্থাপনের মতো বড় সংখ্যায় মুসলমান জনগোষ্ঠী বখতিয়ারের আগে থেকে নদীয়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে আগে থেকেই ছিল।

ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে বখতিয়ার খলজি সম্পর্কে প্রচার ও অপপ্রচার

বখতিয়ার খলজি সম্পর্কে উপরিউক্ত বিবরণ পাঠের সময় এটা মনে রাখা জরুরি, বঙ্গের ইসলাম প্রসারের মতো তিনিও নানানভাবে ভুল প্রচারণার শিকার। বিশেষ করে মগধের অনেক ধ্বংসলীলার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা হয় পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই। ফলে ইতিহাসের ওই সময়টা পাঠ করতে গিয়ে আমরা আসলে দুটি সমস্যায় পড়ছি—একদিকে ইসলাম বিস্তৃতির আলোচনা চলে যায় তরবারিবাদের

বিবরণের দিকে; আবার বখতিয়ারকে অযথা কালিমালিপ্ত করতে গিয়ে সত্য-মিথ্যার মিশেলে অনেক ধ্বংসলীলার কাহিনি হাজির করা হয় তাঁর নামে। এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা সামলিয়ে বিহার ও বাংলার ইতিহাসে বখতিয়ারের ভূমিকার একটা নির্মোহ ভাষ্য দাঁড় করানো জরুরি। তবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমাদের জন্য এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের প্রশ্নে তৎকালীন সমাজের একটা সম্ভাব্য সঠিক ছবি খুঁজে পাওয়া। কাজটি সহজ নয়। কারণ, ইতিমধ্যে আমরা এমন এক জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে আছি, যেখানে একদিকে তরবারিতত্ত্ব[১৭] কেবল কবিতায় নয়; গদ্যেও বিপুলভাবে স্তূপ হয়ে আছে, আবার বখতিয়ার-ঘৃণারও আধিক্য সীমাহীন। যাঁরা বখতিয়ারকে বিশিষ্ট জিহাদি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, তাঁদের বিবরণে যেমন সত্য, অর্ধসত্য এবং অসত্যের ব্যাপক মিশ্রণ ঘটেছে, তেমনি আরেক দল তাঁকে শুধু নিষ্ঠুর দস্যু হিসেবে দেখাতে গিয়েও তখনকার সামগ্রিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ অবহেলা করেছেন।

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসচর্চায় বখতিয়ারকে আফগানিস্তান থেকে আগত দেখানো হলেও খলজি ট্রাইব মূলত তুর্কি অঞ্চলের। *তবকাত-ই-নাসিরী*র ইংরেজি অনুবাদক রেভার্টির স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে এ বিষয়ে। তখনকার তুরস্ক থেকেই এদের একাংশ আফগানিস্তানে আসে। তারপর বিভিন্ন আক্রমণকারী সৈন্য দলের হয়ে ভারতে এদের আগমন। আফগানিস্তানে এরা মূলত যাযাবর পশুচারণা পেশাজীবী হিসেবে পরিচিত। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এরা আফগানিস্তানে আসে। আফগানিস্তানে এরা গিলজি বা গিলজাই নামেও উচ্চারিত ছিল। ওই 'গিলজাই' ভারতবর্ষে এসে 'খলজি' রূপে উচ্চারিত।[১৮] প্রাথমিকভাবে অন্য শাসকদের সৈনিক হিসেবে এবং সমর কৌশলে দক্ষ হওয়ায় পরে নিজেরাই 'শাসক' হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার বাইরে তাদের চরিত্রে 'জিহাদি' গৌরব আরোহ ইতিহাসসম্মত নয়।

বখতিয়ারের মতোই তথ্য-বিকৃতি দেখা যায় বাংলায়, তিনি যাকে 'পরাজিত' করেন বলে প্রচারিত হয়, সেই লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কেও। বলা হয়, লক্ষ্মণ সেন 'হিন্দু রাজা' ছিলেন। কার্যত তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তথ্য হিসেবে এটা হয়তো সামান্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে *তবকাত-ই-নাসিরী* কিন্তু এ-ও জানাচ্ছে, লক্ষ্মণ সেন রাজা হিসেবে 'দানশীল' ও 'ঔদার্য'-এর প্রতীক ছিলেন। আল মাহমুদ লক্ষ্মণকে 'জালিম' হিসেবে উল্লেখ করলেও মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁকে 'মহান ব্যক্তি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেননি। লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে তিনি এ রকম লিখেছেন :

> কোনো কোনো বিশ্বস্ত লোকের বর্ণনায় এমন পাওয়া যায়, যেন ছোট বা বড় কোনো অত্যাচার তিনি কোনো দিন করেননি। একালের হাতেম দয়াশীল সুলতান কুতুব-উদ্দ-দীনের (তাবসারাহ) মতো তিনি দাতা ছিলেন এবং কেউ তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে এক লক্ষ মুদ্রা দান করতেন। এ বর্ণনা আছে যে, ওই দেশে চিতল বা জিতল-এর পরিবর্তে কড়ির প্রচলন ছিল। কমপক্ষে এক লক্ষ কড়ি তিনি দান করতেন।[১৯]

বখতিয়ারের জন্য আমরা যদি মিনহাজ-ই-সিরাজকে সত্য মানি, তাহলে লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে না মানা স্ববিরোধিতা। তবে এ প্রশ্নও ওঠে, এত ভালো রাজা হলে লক্ষ্মণ সেন নদীয়ায় হেরে গেলেন কেন? এর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, বখতিয়ারের নদীয়া আগমনকালে লক্ষ্মণ সেন ছিলেন অতিবৃদ্ধ। তাঁর পক্ষে এ সময় বিশাল সাম্রাজ্যের ঐক্য ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বখতিয়ার আসার আগেই অন্তত তিনজন স্থানীয় শাসক লক্ষ্মণ সেনের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের সাম্রাজ্য বখতিয়ার আসার কালে পর্যুদস্ত হওয়ার অপেক্ষাতেই ছিল।[২০]

দ্বিতীয়ত, নদীয়া (নওদীহ বা নবদ্বীপ) সেনদের ক্ষমতার ভরকেন্দ্রও ছিল না। যদিও মিনহাজ-ই-সিরাজ একে 'রাজধানী' বলেছেন, কিন্তু 'সমগ্র নবদ্বীপে এমন কোনো প্রত্নকীর্তির চিহ্ন নেই, যাতে করে ধারণা করা যেতে পারে যে লক্ষ্মণ সেনের মতো প্রবল প্রতাপশালী নৃপতির শাসনকেন্দ্র বা কয়েক বছরের অবস্থান সেখানে ছিল।'[২১] গঙ্গাতীরে অবস্থিত নবদ্বীপ বা নদীয়া ছিল তখন হিন্দুদের একটা 'পুণ্যস্থান'।[২২] গঙ্গার মূলস্রোত তখন ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত হতো। 'বৃদ্ধ রাজা সেখানে ধর্মকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।'[২৩] শাসক হিসেবে সেনদের ক্ষমতার বড় ভরকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর বা সোনারগাঁ। সেটা বখতিয়ার খলজির নদীয়া অভিযানের পরও যে অব্যাহত ছিল, সেটা আগেই বলা হয়েছে। বঙ্গ ছাড়াও লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য মিথিলা (উত্তর বিহার), রাঢ়, বরেন্দ্রসহ আরও বহু স্থানে বিস্তৃত ছিল।[২৪]

বখতিয়ার ও লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে উপরোক্ত চিত্র আমাদের এটাই জানায়, ঘোড়া ও তরবারিতত্ত্ব একদিকে যেমন এই উভয় ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে আবেগনির্ভর অনেক বাড়তি তথ্য ছড়িয়েছে, তেমনি অনেক বাস্তব তথ্য আড়াল করেছে।

এ রকম আবেগনির্ভর একপেশে ইতিহাসচর্চার সূত্রেই এটাও ছড়ানো হয়, বখতিয়ার খলজি বিহার অভিযানকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন। বাস্তবে নালন্দা ধ্বংস হয় ১১৯৩ সালে[২৫], আর বখতিয়ারের বিহার অভিযান ছিল আরও দুই বছর পর। বখতিয়ার খলজি ভারতবর্ষেই ঢোকেন ১১৯৫ সালে। তবে নালন্দা ধ্বংসে যুক্ত না থাকলেও তিনি বিহার বা মগদের ওদন্তপুরীর একটা শিক্ষালয় (বিহার) ১১৯৯ সালে ধ্বংস করেছিলেন। নালন্দা ধ্বংসে বখতিয়ার যেমন নির্দোষ তেমনি ওদন্তপুরীর ঘটনায় বখতিয়ারের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চুপ থাকারও সুযোগ নেই। এটা মোটেই কোন 'ভুল-বোঝাবুঝি' হিসেবে উল্লেখ করেন।

ওদন্তপুরী স্থানটি নালন্দা থেকে দূরে অবস্থিত ভিন্ন জায়গা। ওখানকার অভিযানগুলো থেকে পাওয়া ধন-সম্পদ দিতেই বখতিয়ার খলজি ১২০৩ সালে কুতব-উদ্-দীন আইবেকের কাছে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে ধন-সম্পদ সংগ্রহ ও তা ঊর্ধ্বতন শাসকদের নজরানা হিসেবে দেওয়ার সঙ্গে ধর্মপ্রচার

বা জিহাদের যে সামান্যই সম্পর্ক, সেটা বলাই বাহুল্য।[২৬] বখতিয়ারের মতোই কুতব-উদ্-দীন আইবেকও ছিলেন তুর্কি। উপমহাদেশে তুর্কিদের এরূপ সমরবাদিতাকে 'ইসলামের জয়-পরাজয়-বিজয়' হিসেবে দেখার যে রেওয়াজ আমরা ইতিহাসসূত্রে পাই, সেটা প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের ইসলামের ইতিহাসের বড় এক ভ্রান্তিপূর্ণ অধ্যায়। তুরস্ক বা আফগানিস্তানের যোদ্ধাদের বাংলার অভিযান ও দখলকে আমরা যদি 'ইসলামের প্রতিষ্ঠা' বা 'মুসলমানদের শাসনের শুরু' হিসেবে দেখি, তাহলে এর ৫৫৫ বছর পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা বাংলায় সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ও বিতাড়নকে দেখতে হয় 'বাংলায় খ্রিষ্টানদের শাসন'-এর প্রতিষ্ঠা হিসেবে! সাড়ে পাঁচ দশকের ব্যবধানে 'ক্ষমতা দখল-বেদখলের' এই উভয় অধ্যায় অনেক সমরূপতা নির্দেশ করে[২৭]—কিন্তু তাকে ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা দুরূহ।

বাংলায় ইসলামের প্রচার-প্রসার : কিছু সাধারণ বিবেচনা

নির্মোহভাবে ও সম্প্রদায়গত পক্ষপাতের বাইরে দাঁড়িয়ে বাংলায় ইসলামের প্রসার সম্পর্কে অনুসন্ধানের চেষ্টা খুবই অল্প। কারণ হিসেবে তথ্য, উপাত্ত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের অপ্রতুলতার কথা বলা হয়। সেটা অসত্য নয়। ফলে ধর্ম প্রসারের ইতিহাসের জায়গা দখল করে রেখেছে রাজা-বাদশাহদের শাসনের কাহিনি। এখানে ইসলামের বিস্তৃতিতে বিশেষ ধরনের এক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য আকুলতা যে বড় ভূমিকা রেখেছে, সেটা বাংলার ভেতরকার স্বল্প কয়েকজন অনুসন্ধানকারী কেবল গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন এ পর্যন্ত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মনীষীরা এবং বিদেশের অনেক গবেষক বরং অধিক হারে সে রকম পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলো করেছেন এবং করছেন। এ রকমই এক লেখায়[২৮] মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য ছিল, ইসলামের একেশ্বরবাদের মাঝে একটি শক্তিশালী সমাজ গঠনের সদূরপ্রসারী সম্ভাবনা দেখেছিল স্থানীয় সমাজ। ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির স্বার্থে তাঁদের দরকার ছিল আধ্যাত্মিক ঐক্য। ইসলাম এখানে পুরোনো সমাজের সেই অসমাপ্ত কাজের সমাধা করেছে। নতুন 'বিশ্বাস'কে স্থানীয়রা দেখেছিল নতুন সমাজবিপ্লবের বীজ হিসেবে। এর পরিবর্তে ইসলামকে কেবল যুদ্ধবিগ্রহের ফল হিসেবে দেখলে বাংলার সমাজ-ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল অবিচার করা হয়। ইসলাম আবির্ভাবের রাজনৈতিক তাৎপর্য তাতে বাদ পড়ে। ঘোড়া ও তরবারিবাদ ইসলামের স্থানীয় ধরনের তাৎপর্যের সামান্যই বুঝতে সক্ষম।

এ লেখায় এর আগে বাংলায় ইসলাম প্রচারের কয়েকজন আরব বুজুর্গের নাম উল্লেখ করেছি আমরা। উপমহাদেশে ইসলামের প্রচারের প্রাথমিক উদ্যোগগুলো যে একপর্যায়ে এ রকম আরবদের থেকে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনপ্রিয় কোনো কোনো তুর্কি ও আফগান আগ্রাসীর হাতে মলিন হয়েছে, সেটা অস্বীকারের সুযোগ নেই। এটাও সত্য, আরবদের

তরফ থেকেও ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধের প্রবল ইতিহাস আছে। আশপাশের অঞ্চলে আরবদের সেই যুদ্ধগুলো ছিল আসলে জরাগ্রস্ত নানান রাষ্ট্রকাঠামো ধ্বংস করে বহুকালের গোত্রযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সেখানে বাণিজ্য বিকাশের উপযোগী নতুন শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ার প্রকল্প। সেই ইসলামের মাঝে আছে আব্বাসীয় খলিফাদের হাতে বাগদাদে থেকে, ফাতেমীয়দের সময় উত্তর আফ্রিকাজুড়ে এবং উমাইয়াদের মাধ্যমে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিস্ময়কর সব আয়োজনের কথা।

অন্যদিকে উপমহাদেশে তুর্কি-আফগানদের অভিযানগুলো ছিল স্পষ্টত সাম্রাজ্য দখল ও নিজস্ব ক্ষমতা কায়েম। এটা নেহাতই ভিন্ন চরিত্রের অভিযান। যদিও এতে ধর্মীয় আবরণ দিয়েছেন কিছু লেখক-গবেষক। বাংলায় ইসলামের বিস্তৃতির প্রধান কারণ সেটা নয়। প্রধান পদ্ধতিও সেটা ছিল না। ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের ধারণা অবশ্যই গৌরবেরও নয়। লুটপাট ও ধর্ম প্রচার ইসলামের প্রাথমিক নির্দেশনার সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। 'ফৌজে এলাহি'দের (খোদার সৈনিক) জন্য খলিফা আবু বকরের নসিহত ছিল, 'ফলের গাছও নষ্ট করা যাবে না, খাদ্যশস্য এমনকি পশুও নয়।' আশ্রমবাসীদের প্রতিও কদাচিৎ কঠোর হবে।'[২৯]

অথচ বখতিয়ার খলজি কী করলেন? *তবকাত-ই-নাসিরী* থেকে বিহারের ওদন্তপুরী অভিযানের ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হলো সংক্ষেপে (মিনহাজ-ই-সিরাজের মূল বিবরণের ইংরেজি তর্জমাও নিচে রেফারেন্স হিসেবে থাকল পাঠকের বিবেচনার জন্য)।[৩০]

> বিহারের শহর ছিল দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। সেখানে গুছিয়ে আক্রমণের আগে লুটপাটের অংশ হিসেবে বখতিয়ার বিভিন্ন স্থানে হানা দিতেন। বিশ্বাসী সহযোগীরা তাঁর সঙ্গে থাকত। এ রকম এক সময়েই দুর্গসদৃশ একটা স্থানে দুই শ ঘোড়া সওয়ারিসহ হঠাৎ আক্রমণের ঘটনা ঘটে। সে সময় ফারগানার বেশ শিক্ষিত দুই ভাইও এই অভিযানে ছিল। এদের একজন নিজাম উদ দীন, আরেকজন শামশাম উদ দীন। এদের একজনের সঙ্গে ৬৪১ হিজরিতে কথা বলেই এই বিবরণ লিখছি। দুর্গসদৃশ জায়গাটিতে আক্রমণকালে বখতিয়ার একটা গুপ্ত দরজা দিয়ে সেখানে ঢুকে গেলেন। প্রচুর সম্পদ পাওয়া গেল। এখানে অধিবাসীদের বড় অংশ ছিল ব্রাহ্মণ। তাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল। সবাইকে হত্যা করা হয়। প্রচুর কিতাব দেখা গেল। এসব বইয়ের অর্থ উদ্ধারের জন্য কিছু হিন্দুকে ডাকা হলো। সেই হিন্দুদেরও মেরে ফেলা হলো। বইগুলোর বিবরণ থেকে বোঝা গেল, এই দুর্গ ও শহরটি আসলে একটা বিদ্যাপীঠ।

অনেক ভারতীয় গবেষক এই ঘটনাকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। ওদন্তপুরী নালন্দার কাছাকাছি বিহার শরিফ নামে একটা জায়গা। মূল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নয় মোটেই। অর্থাৎ বখতিয়ার ও তার বাহিনী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেননি। সেটা বৌদ্ধ ও হিন্দুদের দ্বন্দ্বে ভিন্ন সময় ভিন্ন কারণে পোড়ে। আপাতত সেই আলোচনা থাক। তবে এটা আড়াল করার সুযোগ নেই, ওদন্তপুরীতে বখতিয়ারের

মাধ্যমেও অন্যায়ভাবে বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এটা কি 'জিহাদ' হতে পারে? 'বখতিয়ারে ঘোড়া'য় আমরা জিহাদেরই উল্লেখ পাই।

ওপরে সমর অভিযানে ইসলামের প্রথম খলিফার ধ্বংসবিরোধী যে নির্দেশনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের মূল অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে ধারণ করে আছে। এর একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দেন এম এন রায় এভাবে :

> 'মূল মতবাদই ইসলামকে সহিষ্ণু করেছে। ইসলাম একথা বিশ্বাস করে, সমস্ত জগৎ তার দোষত্রুটি নিয়ে এক খোদারই সৃষ্টি।...এই ধর্মমত কোনো দিনই অনুসারীদের একথা শেখায় না যে কোন ভ্রান্তগোষ্ঠী কোনো দুর্বৃত্ত ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সে জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যারা পূজা-অর্চনা করে থাকে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে তারা ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু এক খোদারই সন্তান। সে জন্য তারা ভ্রাতৃস্থানীয়। তাদের 'সৎ পথে আনা' ইসলামেরই কর্তব্য বটে, কিন্তু যত দিন তারা স্বেচ্ছায় মুক্তির পথ বেছে না নেয়, তত দিন সহজভাবেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

বলা বাহুল্য, বখতিয়ার খলজির বহুল আলোচিত মগধ অভিযানে আমরা এ রকমটি দেখি না।

আর বাংলায় কী ঘটেছিল? এখানে কি ইসলাম তার মূল শিক্ষা ছেড়ে তরবারির মাধ্যমে এগিয়েছে? প্রশ্নটি এভাবেও তোলা যায়, এখানে ইসলামের বিস্তৃতি কীভাবে ঘটেছিল? ইতিহাসবিদ ও অর্থনীতিবিদ আকবর আলি খান তাঁর ২০১৮ সালের এক বক্তৃতায় এই প্রশ্নের চারটি সম্ভাব্য উত্তর চিহ্নিত করে সব কটির একরূপ ময়নাতদন্ত করেন। বাংলায় ইসলাম প্রসারের সম্ভাব্য সেই চারটি উত্তর হতে পারে :

ক. ইসলাম ধর্ম প্রসারে মুসলমান শাসকেরা ভূমিকা রেখেছেন;

খ. ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্ববাদী আচরণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের প্রতিবাদ হিসেবে আগের ধর্মত্যাগ ঘটেছে;

গ. হিন্দু শাসকদের উৎপীড়ন থেকে বাঁচতে বৌদ্ধরা ব্যাপক হারে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে; এবং

ঘ. পীর-দরবেশদের মাধ্যমে নতুন ধর্মের প্রসার ঘটেছে।

ওপরের চারটি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে ইসলামের প্রসারে সবচেয়ে কম ভূমিকা শনাক্ত হয় প্রথম পদ্ধতিতে। ভীতি প্রদর্শন বা নিপীড়নের মাধ্যমে নতুন ধর্মে দীক্ষার নজির বিরল না হলেও তার উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা দেখা যায় না বাংলায়; এমনকি অন্যত্রও। দিল্লি ও উত্তর ভারতের উদাহরণ দিয়েছিলাম আমরা ওপরে। ক্ষমতার উত্তাপে গণহারে কোনো নতুন ধর্মের প্রসার ঘটলে উত্তর ভারতে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকত। ইসলাম প্রসারে যোদ্ধাদের ভূমিকা-তত্ত্ব এমনকি এমন প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে না যে মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া ও ঢাকার মতো মুসলমান শাসকদের অবস্থানের প্রধান প্রধান অঞ্চল থেকে নোয়াখালী-চট্টগ্রামের মতো দূরবর্তী অঞ্চলে কেন মুসলমানদের সংখ্যাগত প্রসার অধিক। ১৮৮১ সালের শুমারিতেও দেখা গেছে,

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় যখন মুসলমানদের হিস্যা যথাক্রমে ৪৮ ও ৫৬ শতাংশ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে তখন সেটা ৭৪ ও ৭১ শতাংশ। শেষোক্ত অঞ্চলগুলো নতুন ধর্মের প্রসারে এগিয়ে গেল কেন?[৩১] এমনকি সুদূর ভেনিস থেকে আসা পর্যটক সিজার ফেডেরিসি সন্দ্বীপের মতো স্থানে কেন 'প্রায় পুরো জনসংখ্যা মুসলমান' পেলেন?[৩২] তরবারি কাজ করলে অন্তত ১৮৮১ সাল পর্যন্ত বাংলায় 'শাসক শ্রেণী'র সংখ্যালঘু হয়ে থাকার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

আকবর আলি খানের মতে, ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়নে নিম্নবর্ণের মানুষের দলে দলে সাম্যবাদের খোঁজে ইসলাম গ্রহণের ধারণাও এই কারণে বিশেষ সমর্থন করা যায় না যে এ রকম সমস্যা ভারতের অন্যত্রও ছিল। কিন্তু সেসব অঞ্চলে ব্যাপক ধর্মান্তরের নজির নেই। ১৮৭২ সালের প্রথম শুমারিতে যে চারটি এলাকায় মুসলমানদের ঘনত্ব বেশি দেখা গেছে, সেগুলো ছিল পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান।[৩৩] তা ছাড়া বাংলায় মুসলমান সমাজেও বর্ণপ্রথার প্রবল প্রভাব ঢুকে পড়েছিল আশরাফ, আতরাফ, আরজল ইত্যাদি শ্রেণিভেদের মাধ্যমে।[৩৪] একই রকমভাবে সেনবংশসহ অন্যান্য হিন্দুর দ্বারা বাংলার বৌদ্ধদের উৎপীড়িত হওয়ারও ব্যাপক কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ফলে ইসলামের পতাকাতলে গণহারে বৌদ্ধরাও শামিল হয়েছে—এমন সাক্ষ্য মেলে না।[৩৫] বরং বাংলায় ইসলামের প্রসারে চতুর্থ ধারণা, তথা পীর-আউলিয়াদের ধীরলয়ের ভূমিকাই প্রবল দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, আলী কলন্দর, কুতুবুদ্দিন, নিজামুদ্দিন প্রমুখ প্রভাবশালী পীর থাকার পরও বাংলায় কী কারণে পীরদের সফলতা অধিক বলে ধরতে হবে? এর উত্তর হিসেবে আকবর আলি খান বাংলার গ্রামের গড়নকে চিহ্নিত করেন। গবেষক অসীম রায় এ বিষয়ে যেটা বলেন[৩৬], পীর ও দরবেশরা বাংলায় প্রকৃতির রুদ্ররোষের শিকার মানুষকে সংঘবদ্ধকারী শক্তি হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন। একটা বন্ধন সৃষ্টিকারীর চরিত্র ছিলেন তাঁরা। স্থানীয় সমাজের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতে পেরেছিলেন তাঁরা— অস্থিতিশীল ভৌগোলিক পরিবেশে অসহায় মানুষের যা দরকার হয়। রিচার্ড এম ইটনও বাংলায় পীরদের অনুরূপ ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের তিনটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী বৈশিষ্ট্যের কথা জানান। সেগুলো হলো সম্মোহনী শক্তি, সাংগঠনিক দক্ষতা ও চাষবাস সম্পর্কে পরামর্শ। এতে তারা স্থানীয়দের আধ্যাত্মিক শান্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও পথ দেখান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাবেক অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী এই প্রক্রিয়াকে এভাবে শনাক্ত করেছেন :

> বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব এবং উত্থানে কৃষির বিকাশ ও নদীগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে জনবসতি স্থানান্তরের একটা ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় ঐতিহাসিক এই প্রক্রিয়াকে আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। এখানে গণধর্ম আকারে ইসলামের

বিকাশে যেসব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে, তার মধ্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা। এর ফলে বাংলায় কৃষির ভরকেন্দ্র পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক দিকে সরে গিয়েছিল। এরই চূড়ান্তরূপ দেখি আমরা যখন পদ্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় গঙ্গা। এতে করে গঙ্গার মূলস্রোত পূর্ব বাংলার ভেতর দিয়ে বইতে শুরু করে। অঞ্চলটি তখন তুমুল উর্বর হয়ে ওঠে। এর নিম্নাঞ্চলে ব্যাপক বিস্তার ঘটে বন ও ঝোপঝাড়ের। এ সময় ক্রমে বাংলার অন্য জায়গা থেকে দরিদ্ররা বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের দিকে সরে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে সেখানে ঝোপঝাড় বন সরিয়ে আবাদে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন পীর, গাজী, সুফিদের দল। যাঁরা সেখানে 'সাংস্কৃতিক মধ্যস্থকারী'র ভূমিকা পালন করছিলেন। এই প্রক্রিয়াতেই পূর্ব বাংলার নতুন বসতি স্থাপনকারীরা ইসলামের পরিসরে প্রবেশ করে—তাদের পুরোনো সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারসহ। ফলে আমরা দেখব, যেটা অন্যত্র ঘটেনি—পূর্ব বাংলার ইসলামে স্থানীয় অতীত সংস্কৃতির প্রবল জের ছিল এবং এখানকার কৃষিজীবীদের কাছে ইসলামকে কখনো বিদেশি কিছু মনে হয়নি। অন্তত ইসলাম বিস্তৃতির প্রাথমিক দিনগুলোতে।[৩৭]

এই ধরনের বিবরণের অন্যতম উৎস আসলে রিচার্ড ইটনের বিখ্যাত গবেষণা। ইটন অনেকটা জেলা ধরে ধরে এ রকম বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে বাগেরহাটের খানজাহান আলীর বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেন :[৩৮]

দরবেশ খান জাহান ছিলেন বাগেরহাটের একজন পৃষ্ঠপোষক।...তাঁর স্মরণীয় কৃতিসমূহের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় জঙ্গল পরিষ্কার করা, সেটা আবাদের জন্য প্রস্তুত করা, ইসলামের প্রসার ঘটানো এবং এলাকায় অনেক রাস্তাঘাট ও মসজিদ নির্মাণ।...তিনি অবশ্যই একজন কার্যকর নেতা ছিলেন। অঞ্চলটির পূর্বেকার ঘন বনকে ধানখেতে রূপান্তর করতে শ্রেয়তর সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রচুর জনশক্তির প্রয়োজন ছিল। একদিকে লোনাপানি সরিয়ে রাখার জন্য পানিপ্রবাহ বরাবর জমিতে বাঁধ দেওয়া, পানি মজুদের জন্য পুকুর খনন, শ্রমিকদের জন্য কুঠির তৈরি ইত্যাদি বহু কাজ ছিল। এসব সম্পন্ন করেই ধান চাষ শুরু হতো। না হলে নলখাগড়া ফিরে আসত। এসব ছিল কষ্টকর তৎপরতা। এসব কাজ কঠিন করে তুলত বাঘ ও জ্বরের উপস্থিতি। খানজাহান লোকদের স্থাপত্যের বিশাল কর্মকাণ্ডের দিকেও ধাবিত করেন। বিভিন্ন জরিপ তাঁকে অর্ধশতাধিক স্থাপনা তৈরির কৃতিত্ব দিয়েছে। আর লোক-ঐতিহ্য দাবি করে তিনি ৩৬০টি মসজিদ এবং সমসংখ্যক দীঘি বানিয়েছেন।... তাঁকে অঞ্চলের অসংখ্য সড়ক নির্মাণের কৃতিত্বও দেওয়া হয়।...সংক্ষেপে খানজাহানকে স্মরণ করা হয় শুধু বনের একজন অগ্রপথিক হিসেবেই নয়—একজন সভ্যতা নির্মাণকারী হিসেবেও।

কেবল কৃষি ও অবকাঠামোগত নতুন 'সভ্যতা' নির্মাণই নয়, জেমস ওয়াইজ প্রান্তিক বাংলায় (রাষ্ট্রীয় সেবার অনুপস্থিতির মাঝে) পীরদের বিভিন্ন সেবাধর্মী কর্মসূচির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল রোগ নিরাময় ও বিচারমূলক কাজ। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে এ রকম পীরদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল ছিল। দূরদূরান্ত থেকে তাদের 'মাজার'-এ নানান ধর্মের মানুষের আগমন তা নির্দেশ করত।

তবে শুধু এসব কারণেই বাংলার পীররা উত্তর ভারতীয় পীরদের চেয়ে বেশি সফল নন। তাঁদের সফলতা এনে দিয়েছিল (আকবর আলি খানের মতে) বাংলার গ্রামের

উন্মুক্ত চরিত্র। এর প্রমাণ হিসেবেই দেখা যায় বঙ্গীয় বদ্বীপে প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে ইসলামের প্রসার ঘটেছে বেশি। ওই সব গ্রামের চরিত্র ছিল কেন্দ্রের চেয়ে অনেক উদার ও স্বাধীন। যেখানে ব্রাহ্মণ ছিল কম। 'বিশ্বাস' বদলের কারণে ত্যাজ্য হলে সেখানে পৃথক গ্রাম গড়বার মতো যথেষ্ট পরিসর ছিল। উত্তর ভারতীয় প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের আঁটোসাঁটো গ্রামগুলোতে যা সম্ভব হতো না। মুসলিম শাসনের কেন্দ্রগুলো থেকে বহু দূরের অঞ্চলগুলোতে অধিক মুসলমানের দৃশ্যমান হবার এই চমকপ্রদ বিষয় খেয়াল করেই হেনরি বেভারলিও সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, বাংলায় মুসলমানদের অস্তিত্ব বেড়েছে শাসকদের কারণে নয়, বরং কিছুটা বর্ণ শৃঙ্খল প্রভাবিত পরিবেশের কারণে।[৩৯] এসব উন্মুক্ত ও দুর্বল গঠনের গ্রাম থেকে ধর্মান্তর যতটা সহজ, উত্তর ভারতের কেন্দ্রীভূত গ্রামগুলোতে সেটা সম্ভব ছিল না। এ কারণেই বাংলায় পীর দরবেশদের সফলতার হার বেশি।

উল্লেখ্য, বেভারলি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম শুমারির পরিচালক তথা ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন। বাংলার সব প্রান্ত থেকে আসা তথ্য-উপাত্তগুলোর তাৎপর্য প্রকৃতই এমন এক বাস্তবতা, যা আজও তখনকার সমাজ বুঝতে অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বেভারলি সেটাই কেবল সবাইকে জানিয়ে গেছেন দীর্ঘ এক বিবরণে 'রিপোর্ট অন দ্য সেনসাস অব বেঙ্গল' শীর্ষক ১৮৭২ সালের প্রকাশনায়।[৪০] উদ্বৃতি দীর্ঘ হলেও ওই রিপোর্ট থেকে কিছু চুম্বক কথা তুলে ধরা হলো এখানে :

> ৩৪৯. ...কৌতূহল বেড়ে গেল, যখন দেখা যাচ্ছে—মোগলদের সান্নিধ্য পাওয়া রাজধানীসুলভ এলাকাগুলো নয়, মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি বাংলার অন্যত্র। এ রকম কিছু কিছু জেলায় তারা সংখ্যায় চার ভাগের তিন ভাগ। বগুড়ায় দেখা গেল পাঁচ ভাগের চার ভাগ।...অথচ গৌড়ের মালদায় ৪৬ শতাংশ। মুর্শিদাবাদে ৪৫...। অথচ বাকেরগঞ্জ-ত্রিপুরা-রংপুর-ময়মনসিংহে তারা দুই-তৃতীয়াংশ।...এসবই ইঙ্গিত করে বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যায় বেড়েছে মোগলদের মতো শাসকদের আবির্ভাবের কারণে নয়; বরং সাবেক অধিবাসীদের মাঝে থাকা বর্ণপ্রথার কঠোর অসহিষ্ণুতার কারণে।...
>
> ৩৫০. বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে, নিম্নবর্গ এবং বিভিন্ন ট্রাইব ইসলামে আকর্ষিত হয়েছে। ফরিদপুরে ও বাকেরগঞ্জে অনেক বড় সংখ্যায় চণ্ডাল, রংপুরে অনেক কোচ ইসলাম গ্রহণ করেছে। যাদের মর্যাদা রাজবংশীদের মতো ছিল না।...যেখানেই মুসলমানদের সংখ্যায় বেশি পাওয়া গেছে, সেখানেই এ-ও দেখা গেছে, কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীরা বেশি।[৪১] এটা একটা নিয়ম হিসেবে পাওয়া গেছে...
>
> ৩৫২. ...ইসলাম যখন বঙ্গের নিম্নাঞ্চলে আসে...তখন হিন্দুধর্ম একটা অনিশ্চিত ভিত্তির ওপর অবস্থান করছিল। তখন এটা কেবল ধর্ম হিসেবে নয়, এমন এক ব্যবস্থা হিসেবেও আসে, যার মাধ্যমে নিম্নবর্গীয়রা আগের অবজ্ঞার জীবনের পরিবর্তে পুরোনো প্রভুদের সমান না হলেও একরকম প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াতে শেখে।...ধর্মান্তরে এখানে শাস্তি বা ভয় দেখানোর ঘটনা বিরল।...পূর্বতন অবজ্ঞাসূচক অবস্থান থেকে রক্ষা পেতেই তারা ইসলামে আকর্ষিত হয়।

> ৩৫৩. বিদেশি রক্তের জোরে নয়, মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি অন্য কারণে। এর জন্য যদি যদি আরও প্রমাণ চাওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে, এখানে যারা মুসলমান হলো এবং সমপাটাতনের যারা হয়নি উভয়ের প্রথাসমূহ, গড়ন এক, চুল আঁচড়ানোর মতো বিষয়ও এক। তারা একই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধাস্থলে যায়। তারা প্রায় একই ধাঁচে প্রার্থনা করে। যদিও প্রভুর নাম ভিন্ন। এক দলের কাছে যা 'সত্য নারায়ণ', অন্য দলের কাছে তা 'সত্য পীর;। কেবল 'শেখ' পরিচয়টি এই মুসলমানদের আলাদা করেছে। এটা দিয়ে বোঝা যেত সে ধর্মান্তরিত।

লক্ষণীয়, বেভারলির বিবরণে তৎকালীন বাংলার ইসলাম সামাজিক মুক্তির একটা ছবি হাজির করে। পাশাপাশি বহুত্ববাদী একটা বাংলাকে দেখি আমরা সেখানে। এই দুটি ছবিরই ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। এর সঙ্গে, ইতিহাসবিদ আব্দুল মমিন চৌধুরী বাংলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রাথমিক ইসলামের অগ্রযাত্রার পেছনে সেখানকার মানুষের চারিত্রিক নমনীয়তার বৈশিষ্ট্যকেও বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলেছেন।[৪২] তাঁর মতে, এ কারণেই বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের পরিবর্তে অন্যান্য দিকে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছিল দ্রুতলয়ে। অথচ সেসব এলাকা ছিল শাসকদের অবস্থান থেকে দূরের এলাকা। তাঁর এই বক্তব্য এমন সামাজিক ধারণাকেও সমর্থন করে যে কৃষিজীবী সমাজ বহির্জগতের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয় কম।

উপরিউক্ত মতামতসমূহের সমর্থনসূচক বিবরণ আমরা পাব জেমস ওয়াইজের বিবরণ থেকেও। একদা (১৮৬৬-৬৮ সালে) ঢাকায় সিভিল সার্জন হিসেবে কাজ করে যাওয়া ওয়াইজ ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত (মাত্র ১২ কপি মুদ্রিত!) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটিতে লিখেছেন :[৪৩]

> বঙ্গদেশে ১৮৭২ সালের লোক গণনা শেষে চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসে। এতে দেখা যায় মুসলমানরা দক্ষিণবঙ্গে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাচীন বঙ্গের রাজধানীগুলোর সন্নিহিত এলাকা নয়। সমগ্র বদ্বীপের প্লাবনভূমিতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঢাকা, মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় মুসলমান সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৬, ৪৫, ৪৫ এবং ১২ শতাংশ। অন্যদিকে বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের নদীবিধৌত অঞ্চলে তারা ছিল স্পষ্টভাবে অনেক সংখ্যাগরিষ্ঠ। লোকগণনার এ রকম তথ্য ছিল কল্পনাতীত।...প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস আমরা যত জেনেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যায় অধিক।

ওয়াইজ, ইটন, বেভারলি প্রমুখের এসব বিবরণ বাংলায় ইসলাম প্রচারে মধ্যযুগের মুসলমান শাসকদের অতি সীমিত ভূমিকার কথাই জানায়। সে ক্ষেত্রে আমরা কি সরাসরি এই উপসংহারেই পৌঁছাব—অসীম রায়, ইটন, আকবর আলি খান প্রমুখ যেমনটি বলেছেন—পীর-দরবেশদের মাধ্যমে এখানকার উন্মুক্ত গ্রামে সহজে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে? তখন আবার প্রশ্ন ওঠে, আউলিয়া-দরবেশদের দ্বারা কারা আকর্ষিত হলো? নতুন ধর্মে কারা দীক্ষিত হলো? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের ইসলাম

প্রসারের (উল্লিখিত চারটি বিকল্পে) দ্বিতীয় বিকল্পটিকে প্রথম বিকল্পের সঙ্গে মিলিয়ে উপসংহারে পৌঁছা যৌক্তিক হবে। অর্থাৎ পীররা এখানে সফল হয়েছেন একদিকে যেমন এখানকার প্লাবনভূমির উন্মুক্ত চরিত্রের গ্রামীণ ভূগোলের কারণে, তেমনি নিম্নবর্ণ এবং বর্ণচ্যুত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর নীতির কারণেও। এ বিষয়ে ওয়াইজের বিবরণ[৪৪] এ রকম :

> হিন্দুধর্ম উচ্চবর্ণ প্রভাবিত গ্রাম থেকে নিম্নবর্ণের অচ্ছুতদের নির্বাসিত করেছে। তাদের কঠিন কায়িক পরিশ্রম ও হেয় বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। বৃহত্তর নিম্নবর্ণের জনসাধারণ মানবেতর জীবনযাপন করতে ছিল বাধ্য। দীনতা হীনতা ছাড়া কিছুই তারা পায়নি। পুনর্জন্মবাদী ব্রাহ্মণেরা দলিতদের জন্য পরকালেও ভালো কিছু পাবার আশ্বাস দিতে পারেনি। অথচ মৌলানারা ইহলোকে ফললাভের আশ্বাসবাণী তো শোনাতেনই, পরলোকেও ন্যায়বিচারের কথা শোনাতেন।

ওয়াইজের এ বিবরণ পরবর্তীকালের বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক জরিপ দ্বারাও সমর্থিত হয়। নৃতত্ত্ব ও পরিসংখ্যানবিদ্যার সমন্বয়ে এসব শ্রমসাধ্য গবেষণায় শরীরের গঠন, মাথার আকৃতি, ওজন, রক্তের গ্রুপ ইত্যাদির মাধ্যমে দেখা গেছে, বাংলার মুসলমানদের শরীরী মিল রয়েছে একই অঞ্চলের বর্ণ-বহির্ভূত হিন্দুদের (এর কিছু ব্যতিক্রম ছিল কেবল চট্টগ্রাম)।[৪৫] একই রকম সাক্ষ্য দেয় এ বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক জরিপগুলোও। অর্থাৎ আমরা যদি মধ্যযুগের বাংলার বর্ণ-সম্পর্ক এবং পীর-দরবেশদের ভূমিকাকে সমন্বয় করি, তাহলে এখানে ইসলামের প্রসারের একটা বিশ্বাসযোগ্য পথনির্দেশ খুঁজে পেতে পারি বলেই মনে হয়। এর সঙ্গে মিলাতে পারি আমরা মমতাজুর রহমান তরফদারের সেই বিবরণকেও যেখানে তিনি প্রাক্-মধ্যযুগীয় বাংলায় নৌবন্দর এবং ময়নামতি-লালমাইয়ে পাওয়া আরবীয় মুদ্রার মধ্য দিয়ে বহির্বাণিজ্যের ইঙ্গিত দেন।[৪৬] অর্থাৎ বখতিয়ার খলজির মতো যোদ্ধারা আসার আগেই কৃষিজীবী বাংলার সঙ্গে আরবের একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে পাওয়া এসব মুদ্রা বাংলার প্রাথমিক মুসলমান শাসকদের চালু করা মুদ্রা থেকে ভিন্নতর। শেষোক্ত মুদ্রাগুলো কেবল সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে তৈরি হতো। বাণিজ্যিক লেনদেনের অংশ হিসেবে নয়। মুসলমান শাসকেরা দ্বিতীয় ধরনের মুদ্রার প্রচলন করে চৌদ্দ শতকের দিকে অনেকগুলো টাঁকশাল বানিয়ে।[৪৭]

ইসলামের ইতিহাস সন্ধান ও বাংলার ইতিহাসের মুক্তি

বহিরাগত একজন শাসক হয়েও বাংলার ইতিহাসে বখতিয়ারের নায়ক হিসেবে চিহ্নিত হওয়া যে বাস্তবসম্মত নয়, সেটা দেখেছি আমরা ওপরে। প্রশ্ন হলো, এরপরও কেন তার জন্য এমন উন্মত্ত গর্ববোধ ছড়িয়ে পড়তে পারল। এর কিছু কারণ জ্ঞানতাত্ত্বিক, বড় কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক। বাংলার ইতিহাস চর্চার এখনো বাংলায়ন হয়নি

বলেই এমনটি ঘটতে পারে। স্থানীয় অতীতের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বিবরণের চেয়ে এখানে 'ইতিহাসচর্চা'য় বিদেশি শাসকদের শৌর্য-বীর্যকে মহিমান্বিত করার চল। সেটা এ কারণেও যে এই অঞ্চলের শাসন সংস্কৃতি এখনো সংখ্যালঘু অভিজাত এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাতেই রয়ে গেছে। তাদের জন্য বখতিয়ার বা লক্ষ্মণ সেনদের মতাদর্শ ও রাষ্ট্রদর্শন যতটা উপযোগী ও আরামদায়ক—নিম্নবর্গের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বিবরণ ততটাই অস্বস্তিকর। খেয়াল করলে আমরা এ-ও দেখব, লক্ষ্মণ সেনকে হটিয়ে বখতিয়ারের আগমনে সন্তোষ থাকলেও ওই রকম কোনো রচনায় এ রকম কোনো অসন্তোষ দেখা যায় না যে বখতিয়ার বা মুসলমান রাজশক্তি বাংলার সমাজকাঠামোতে শোষণমূলক সামাজিক সম্পর্কের সামান্যই কোনো পরিবর্তন সাধন করেছে। নিজেদের প্রভাবের সুরক্ষায় শাসনতান্ত্রিক নতুন কিছু পদ্ধতির বিস্তারেই বিশেষ মনোযোগী ছিল তারা।

বাস্তবে সমরবাদ ও কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রচিন্তার জায়গা থেকে সেন বা খলজিদের নীতিকৌশলে একালের শাসকেরা নিজেদের সম্ভাবনা, স্বস্তি ও স্থায়িত্ব দেখেন। 'রাষ্ট্রীয়' সীমার বাইরে দাঁড়িয়ে অতীত বাংলায় পীর-দরবেশ-বুজুর্গ-সন্ন্যাসী-বাউলদের নতুন সমাজ-নির্মাণ চেষ্টার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বোঝার মতো বাংলার ইতিহাস হয়তো আজও সাবালক হয়নি। এই ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার স্থানীয় জীবন্ত মানুষদের খুঁজে পাই না আমরা। তারই ছাপ পড়ে আমাদের সাহিত্যচিন্তায়, গতানুগতিক ভাবুকতায় এবং চর্চায়। কিন্তু এর মাঝে প্রবল এক বিপদের দিক আছে। হয়তো আছে হীনম্মন্যতা বোধও।

উত্তর ভারতের সেনরা বা আরও দূরের আফগান-তুর্কি থেকে আসা খলজিরাই যদি আমাদের 'ইতিহাস' এবং সেই ইতিহাসের প্রধান চরিত্র হয়ে থাকে, তাহলে বাংলার জাতীয় পরিচয় কীভাবে নির্মিত হবে? নতুন প্রজন্ম 'বাংলার ইতিহাস' হিসেবে কী জানবে বা জানছে? আমরা বাংলার বহিরাগত আক্রমণকারীদের কীভাবে দেখব? বহিরাগতের শাসনই কি বিশাল বাংলার শত শত বছরের ইতিহাস হয়ে থাকবে? আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলো কবে প্রকৃতপক্ষে আমাদের হবে? কবে সেগুলো হীনম্মন্যতা থেকে এই জাতিসত্তাকে মুক্তি দেবে? সেগুলোতে যদি বহিরাগত সেন ও খলজিরাই মহিমান্বিত থাকে, তাহলে বাংলার স্বকীয়তা থাকল কোথায়? আগ্রাসী শক্তিসমূহের জন্য গৌরব অন্যভাবে আবার বাংলায় ঐতিহাসিক সামাজিক-সন্ত্রাসকে গৌরবদানও বটে। অথচ গৌরবান্বিত হওয়া উচিত সেসব পদ্ধতি নিয়ে, যা দিয়ে স্থানীয় 'সমাজ' ওই বাইরের শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের মতো করে প্রতিরোধ রচনা করেছিল। যেকোনো জনপদের যে নিজস্ব চৈতন্য থাকে, তার সঙ্গে আগ্রাসনকারীকে মহিমান্বিত করা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। এটা এমন এক বিপজ্জনক তাঁবেদারি, যা এখানকার সমাজের রাজনৈতিক অভিমুখকেও অস্পষ্ট করে রাখে।

শেষ কথা

প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কিংবা আমাদের বহুল আলোচিত ইতিহাসবিষয়ক কিতাবসমূহে মধ্যযুগের বাংলা নানানভাবেই উপস্থিত। সেখানে যে বাংলাকে আমরা পাই, তার একরূপ কাব্যিক প্রকাশ আল মাহমুদের 'বখতিয়ারের ঘোড়া'। তিনি আমাদের মূলধারার ইতিহাসকে নিজের আবেগ, বিশ্বাস ও দর্শন দিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন ১৮৬ শব্দে। কাব্যের বিবেচনায় সফল হলেও সেই দেখা ইতিহাস-চৈতন্যের দিক থেকে কীভাবে সমস্যা তৈরি করে, সেটা দেখেছি আমরা এই আলোচনায়। এটা একই সঙ্গে বাংলার ইতিহাসবিদ্যার গভীর সংকটেরও একাংশ। বাংলার ইতিহাসের এই অসুস্থতা ইসলামের ইতিহাসকেও সংক্রমিত করতে উদ্ধত, সেটাও আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। বাংলায় ইসলামের ইতিহাসের প্রকৃত অনুসন্ধান আসলে স্থানীয় সব জাতিসত্তার ইতিহাসের আরও বাড়তি অনুসন্ধানেরও অপরিহার্য অংশ। এটা রাজনৈতিক কাজও বটে। সেই 'কাজ' আত্মপরিচয়ের রাজনীতি নির্মাণের জন্য নয়; বরং আত্মপরিচয়ের সত্য খুঁজতে। যে 'সত্য' বর্তমান 'বাংলা'কে চলতি আত্মপরিচয়ের টানাপোড়েনকে অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করতে পারে।

এটা বাংলায় জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতাযুদ্ধের মতোও। ইতিহাসের পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতেই হবে আমাদের। ভৌগোলিক স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির লগ্নে আমাদের 'ইতিহাস'-এরও 'মুক্তি' দরকার। পাশাপাশি তার পুরাণধর্মী চরিত্রও বদলাতে হবে। ভৌগোলিক স্বাধীনতার পরও আমরা যখন অতীতের দখলদারদের শৌর্যবীর্যে মুগ্ধ, তখন অবশ্যই আমাদের চিন্তার ইতিহাসের দৈন্য নিয়ে পুনর্ভাবনা দরকার আছে।

আজকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে বাংলাভাষীরা মুসলিম 'উম্মাহ'র বড় এক অংশীদার। বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্রধান একটা অঞ্চলে কীভাবে ইসলামের এত বিস্তৃতি ঘটল, তার কোনো আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব ছিল কি না, সে বিষয়ে সঠিক একটা বিবরণ তৈরি অবশ্যই ইসলামের বৈশ্বিক ইতিহাসের দিক থেকেও জরুরি। উপরন্তু আমরা ইতিহাসকে ঘটনা হিসেবে বা বীরপূজা বা জাতিঘৃণার অংশ হিসেবে পাঠ করব, নাকি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের অংশ হিসেবে পাঠ করতে চাই, সেটাও আজ দরকারি প্রশ্ন হিসেবে সামনে চলে এসেছে।

বখতিয়ারের ঘোড়ায় এমন এক 'শ্রেষ্ঠত্ববাদ'-এর কাব্যরূপ পাওয়া যায়, তা ধর্মের আবরণে আমাদের কোনো বিশেষ জাতিবাদের দিকে নিয়ে যায় কি না, সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে। এ রকম জাতিবাদের মাঝেই লুকিয়ে থাকে 'অন্যকে' 'নিম্নতর' বিবেচনা করে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দখলের চেতনা। এ কবিতার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামের ইতিহাসের মহীয়ান সব সাংস্কৃতিক অবদান এবং তার দার্শনিক শক্তির ছাপ দুর্বল হয়ে পড়ে স্থানীয় পাঠকের মননে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. আল মাহমুদ যেমন বখতিয়ারকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তেমনি তাঁর কবিতাতেই আমরা 'ফসলের সুষম বণ্টন' ও 'শ্রেণী উচ্ছেদ'-এর জন্য (সোনালী কাবিন, ১০ নং সনেট) 'সাম্যের দাওয়াত' দেখি। তিনি যেমন একটি বিশেষ রাজনৈতিক ধারার সংবাদপত্র হিসেবে ঢাকায় দৈনিক *সংগ্রাম* ও চট্টগ্রামে দৈনিক *কর্ণফুলী*তে যুক্ত ছিলেন, তেমনি আবার অনেকখানি বিপরীত ধারার দৈনিক *গণকণ্ঠ*তেও তার আগে যুক্ত ছিলেন। কতটুকু আদর্শিক কারণে এবং কতটুকু আর্থিক কারণে এসব যুক্ততা, সেটা শনাক্ত করা সহজ নয় আজ আর। সুতরাং একটি কবিতায় ব্যক্ত কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক চৈতন্য নিয়ে ব্যক্তি আল মাহমুদ বা তাঁর সমগ্র কাব্যসত্তাকে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। আমরা এখানে কেবল তাঁর কবিতা 'বখতিয়ারের ঘোড়া'য় ব্যক্ত ঐতিহাসিক উপাখ্যানকে পর্যালোচনা করব।

২. এ ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসের একজন সুপরিচিত গবেষক মোহাম্মদ মোহার আলীর লেখা থেকে একটা উদাহরণ তুলে ধরছি এখানে : '...It was one such goup of Turkish chieftains and *military adventurers* under the leadership of Ikhtiyar al-din Muhammad bin Bakhtiyar Khalji who planted *the victorious banner of Islam on the soil on Bengal.*' (*History of The Muslims of Bengal*, V. IA, 1985, p. 47)।

এখানে একই বাক্যে একদিকে খলজিকে military adventurers বলা হচ্ছে, অন্যদিকে তাকে দেওয়া হচ্ছে 'ইসলামের পতাকা ওড়ানোর বিজয়ের গৌরব'। কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত বিপুল কলেবরের এই গবেষণা হয়েছে আবার সৌদি আরবের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধের পর গবেষক মোহাম্মদ মোহার আলী সৌদি আরবে চলে গিয়েছিলেন।

৩. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসন*, বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩২-৩৪।

৪. সরদার আবদুর রহমান, *ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

৫. আজকের বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার মালদা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ইত্যাদি এলাকাকে সেই অভিযানের ভরকেন্দ্র বলা যায়।

৬. যেমন তোঘরীল তোঘান খানের সঙ্গে ওড়িষ্যা অভিযানে সহযোগী হন তিনি। গোওয়ালিয়ার আক্রমণে তিনি সুলতান ইলতুৎমিশের সহযাত্রী ছিলেন।

৭. অনুবাদ : আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪।

৮. *History of The Muslims of Bengal*, V. IA, 1985, p. 51.

৯. বাংলার 'সমাজ' থেকে সেই সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির সংগঠিত উৎখাতের সূচনা মাত্র গত কয়েক শতাব্দীর ঘটনা। মধ্যযুগের বাংলার স্বাধীন মুসলমান সুলতানদের আমলে বরং উল্টো চিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুলতান রুকুন-উদ-দীন, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নাসির উদ্দীন নুসরাত শাহ প্রমুখের সময়ে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা হতে দেখা গেছে, *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (মালাধর বসু), *মনসাবিজয়* (বিপ্রদাস পিপলাই), *পদ্মপুরাণ* (বিজয় গুপ্ত), *কৃষ্ণমঙ্গল* (যশোরাজ খান) ইত্যাদি বাংলা কাব্য। মালাধর বসু ছিলেন বর্ধমানের, বিপ্রদাস উত্তর চব্বিশ পরগনার, বিজয় গুপ্ত বরিশালের মানুষ। একই সময়ে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের লস্কর চট্টগ্রামের শাসক পরগাল খাঁর অনুরোধে মহাভারতের একাংশ অনুবাদ করছেন কবিন্দ্র পরমেশ্বর। এ রকমই ধারাবাহিকতা

পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে দৌলত কাজী এবং আলাওলের লেখনীর বিষয়বস্তুতে। এই উভয় খ্যাতনামা মুসলমান লেখকের রচনায় অনেকভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে উপস্থিত দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এটা মুসলমান শাসকদের দিক থেকে শুধুই ঔদার্যের বিষয় ছিল না, বহিরাগত শাসক হিসেবে অপরিচিত জমিনে নিজেদের রাজত্বের দীর্ঘস্থায়িত্বের কৌশল হিসেবেই হিন্দু-মুসলমানের সুসম্পর্ক তাদের জন্য কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক ছিল। আবার একই সঙ্গে এটা স্থানীয় সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গেও মানানসই ছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে : Sushil Chaudhury, 'Identity and Composite Culture : The Bengal Case', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Hum., Vol. 58 (1), 2013.

১০. আকবর আলি খান, *বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার*, জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৭।

১১. এটা ছিল ৭৮৮ সালের আব্বাসীয় খলিফা হারুণ আল-রশীদের মুদ্রা। Md. Shah Noorur Rahman, *Islam and its early introduction in Bengal*, Indian History Congress, Vol. 56 (1995), pp. 425-434 (10 pages).

১২. রিচার্ড এম. ইটন, *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ*, ইংরেজি থেকে অনুবাদ : হাসান শহীদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১৪৯।

১৩. Dr. Sangeeta B. Sahay, 'Re-assessing the military career of Bakhtiyar Khilji in Bihar', www.iosrjournals.org, Feb 2019.

১৪. *তবকাত-ই-নাসিরী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

১৫. মূল ফারসি থেকে *তবকাত-ই-নাসিরী*র অনুবাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া লিখেছেন, 'সেনদের দলিলপত্রে কোথাও দেখা যায় না গৌড়ে তাদের কোনো রাজধানী বা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। অথচ সেই নগরীর নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রায় সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলকে লক্ষ্ণৌতি রাজ্য বলে অভিহিত করে গেছেন মিনহাজসহ অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক।' পূর্বোক্ত, উপক্রমণিকা, পৃ. ৩৪।

১৬. আবিদ আলী খান, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*, ইংরেজি থেকে অনুবাদ : চৌধুরী শামসুর রহমান, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৭, পৃ. ১৬৯। ১৯০২ সালে মালদহে লর্ড কার্জনের হাতে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর এই তালিকা দেওয়া হয়েছিল। গৌড়ের প্রত্ন-ইতিহাস সম্পর্কে এটা একটা নির্ভরযোগ্য দলিল। একই বিষয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর গৌড় কাহিনিতে (বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৩১৪) বলা হয়েছে : 'লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসাবশেষের মাঝে বখতিয়ার নির্মিত কোনো পুরাতন মসজিদের পরিচয় পাওয়া যায় না। সে রকম কোনো জনশ্রুতিও বর্তমান নাই।'

১৭. দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামের ইতিহাসে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণের ধারণা তথা 'তরবারিতত্ত্ব'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা হলো উইল ডুরান্ট (*The Story of Civilization : Our Oriental Heritage*, 1935)। পরে এই তত্ত্ব এখানে প্রচার করেছে ব্রিটিশ শাসক-বুদ্ধিজীবীরা। মূলত ভারতবাসীকে বিভক্ত করে শাসন করার জন্যই এই তত্ত্বের প্রসার ঘটায় তারা। এরপর সেটা হস্তান্তরিত হয় হিন্দুত্ববাদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের একাংশের কাছে। এভাবেই এর অনুপ্রবেশ ঘটে বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশের মাঝেও। তারই একরূপ পার্শ্বফল হতে পারে বখতিয়ারের মতো চরিত্রদের ক্রমাগত 'মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা' হিসেবে তুলে ধরা। বখতিয়ারকে 'মুসলমান শাসক' হিসেবে চিহ্নিত করা স্পষ্ট ইঙ্গিতবহ। বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে

দশকের পর দশক তার প্রচার—ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার কোনো সচেতন প্রয়াস কি না, সেটাও গভীরভাবে পুনর্ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এ রকম তুর্কি যোদ্ধাদের 'কাজ'কে ভারতবর্ষে 'মুসলমানদের অবদান' হিসেবে দেখানো আজকের ভারতে বিজেপির তরফ থেকেও বিরাট এক বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচি হিসেবে হাজির আছে।

১৮. Sayiedmomin Sayied, 'Khilji Dynesty', www.taand.com,https ://bit.ly/3890RaU

১৯. *তবকাত-ই-নাসিরী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

২০. এ পর্যায়ে এ-ও মনে রাখা দরকার, সেনরাও খলজিদের মতোই বাংলায় বহিরাগত শাসক। মূলত কানাড়িভাষী তারা। সেনরা এসেছিল কর্ণাটকের মহীশূর থেকে। প্রাথমিকভাবে এরা ছিল ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়। অর্থাৎ একই সঙ্গে স্বঘোষিত শাসক ও যোদ্ধা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা যখন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের বাংলার ইতিহাস পড়ি, তখন কেবল এসব বহিরাগত যোদ্ধার ইতিহাস পড়তে বাধ্য হই। এসব শাসককে আমরা মহিমান্বিতও করি। কার্যত এসব বাংলার সমাজের ইতিহাস নয়, তখনকার আগ্রাসী 'শাসকদের ইতিহাস' মাত্র। যদিও তাকেই 'বাংলার ইতিহাস' হিসেবে দেখানো চলছে। আরও বিস্ময়ের দিক হলো, সেন বংশ এবং খলজিদের সঙ্গে তুলনা করলে শাসক হিসেবে পালবংশই অনেক লোকজ এবং বাঙালি চরিত্রের। এই শাসক বংশের গোড়াপত্তনের ধরনও ছিল তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক ধাঁচের। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সুযোগে তাদের উৎখাত করেই সেনরা এসেছিল। আর সেই সেনদের পর এল তুর্কি-আফগান খলজিরা। কিন্তু পূর্বতন স্থানীয় শাসকদের পরিবর্তে বাংলার ইতিহাসচর্চায় বহিরাগত শাসকেরাই প্রশংসিত—যাঁরা মূলত আক্রমণকারী এবং ক্ষমতা দখলকারী।

২১. সরদার আবদুর রহমান, *ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি*, দিব্যপ্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ৯৩।

২২. তবে এমনকি সেখানে কোনো বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও মেলেনি। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর অনুবাদের উপক্রমণিকায় লিখেছেন, 'মিনহাজের বর্ণনায় দেখা যায়, বখতিয়ার বিহার অধিকারের সংবাদ পাওয়ার পর মহারাজা লক্ষ্মণ সেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেটা হলে এই মহারাজা যে নগরীতে কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা করবেন না, তা কল্পনাতীত। আর কিছু না হোক, নগরীর চারদিকে একটা পরিখা অন্তত থাকত। অথচ সারা নবদ্বীপে কোনো পরিখার চিহ্ন পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

২৩. সরদার আবদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।

২৪. হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের রাজধানী ছিল বিজয়পুর। সেটা রাজশাহী থেকে আট মাইল দূরের বিজয়নগর।

২৫. নালন্দা যে ১১৯৩ সালে ধ্বংস হয়েছে, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বহু ভারতীয় ভাষ্যই রয়েছে। দেখুন, Vishnu Kumar Gupta, 'Burning Libraries : A Review through the Lens of History,' *The Journal of Indian Library Association (JILA)*, 54 (1), Jan 2018, p.20। অন্যদিকে বিহারে আসার আগে বখতিয়ার অযোধ্যায় এসেছিলেন বলে সকল ঐতিহাসিকই দেখিয়ে থাকেন। তার আগে তিনি দাউনে ছিলেন। কিন্তু কুতুব-উদ-দীন আইবেক বদাউন অধিকার করেন ১১৯৭ সালে। ফলে এর আগে অযোধ্যায় বখতিয়ারের জায়গীর পাওয়ার কথা নয়।

২৬. কোরআনের বিধান অনুযায়ী অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে সংগ্রহ অনুমোদিত নয়। সুরা বাকারাহ হতে এর বিরুদ্ধে নির্দেশ রয়েছে (২ :১৮৮)। এ রকম ধনসম্পদ গ্রাস করার লক্ষ্যে ঊর্ধ্বতনকে উৎকোচ প্রদানেও নিষেধ করা হয়েছে সেখানে (২ :১৮৯)।

২৭. H. Bolchmann, *Journal of Asiatic Society of Bengal*, 1873, No. 3, p. 211.

২৮. মানবেন্দ্রনাথ রায়, *ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা*, রেনেসাঁস, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৩১।

২৯. মানবেন্দ্রনাথ রায়, *ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭। এ বিষয়ে ইসলামের বিধান সম্পর্কে সাইয়েদ আবু আলা মওদুদি লিখেছেন,

'যারা ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, তারা কোথাও বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদে ধ্বংসলীলা, জুলুম নির্যাতন, গুন্ডামী এবং ব্যভিচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবে না। বরং বিজিত জনপদের অধিবাসীরা এদের প্রতিটি সিপাহিকে পাবে জানমাল, ইজ্জত, আব্রু ও নারীদের সতীত্বের পূর্ণ হেফাজতকারী হিসেবে।' (ইসলামি রাষ্ট্র ও সংবিধান, মওদুদি রিসার্চ একাডেমি, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৪৬৯)।

আর 'বখতিয়ারের ঘোড়া'য় যাকে 'আল্লার সেপাই' বলা হয়েছে এবং শত শত গবেষক যাকে 'বাংলায় মুসলমান শাসনে'র কর্তৃত্ব দিচ্ছেন, তার নদীয়া অভিযান শেষে কী ঘটছে? *তবকাত-ই-নাসিরী* থেকে উদ্ধৃতি :

রায় (লক্ষ্মণ সেন) নগ্নপদে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে নিজ প্রাসাদ থেকে পলায়ন করেন। তাঁর সমুদয় ধনাগার, হারেমের নারী, দাসদাসী, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুর নারী বখতিয়ারের করতলগত হয়। তিনি অসংখ্য হস্তীও অধিকার করেন। মুসলিম সৈন্যদের হস্তে এত লুণ্ঠিত দ্রব্য পতিত হয় যে, তা বর্ণনা করা যায় না।...

(তবকাতের বখতিয়ার অধ্যায়, সরদার আবদুর রহমানের *ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি* গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে সংযুক্ত, দিব্যপ্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ২২৬)

৩০. He (Bakhtiyar Khilji) used to carry his depredations into those parts and that country until he organized an attack upon the fortified city of Bihar. Trustworthy persons have related on this wise, that he advanced to the gateway of the fortress of Bihar with two hundred horsemen in defensive armour, and suddenly attacked the place. There were two brothers of Farghanah, men of learning, one Nizamu-ud-Din, the other Samsam-ud-Din (by name) in the service of Muhammad-i-Bakhtiyar; and the author of this book [Minhaj] met with at Lakhnawati in the year 641 H, and this account is from him. These two wise brothers were soldiers among that band of holy warriors when they reached the gateway of the fortress and began the attack, at which time Muhammad-i-Bakhtiyar, by the force of his intrepidity, threw himself into the postern of the gateway of the place, and they captured the fortress and acquired great booty. The greater number of inhabitants of that place were Brahmans, and the whole of those Brahmans had their heads shaven; and they were all slain. There were a great number of books there; and, when all these books came under the observation of the Musalmans, they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of those books; but the whole of the Hindus were killed. On becoming acquainted (with the contents of the books), it was found that the whole of that fortress and city was a college, and in the Hindu tongue, they call a college Bihar." (*Tabaqat-i-Nasiri*, English translation by H.G. Raverty, pages 551-52).

৩১. ১৯০১ সালের শুমারিতেও দেখা যায়, বাংলায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর পেশা মূলত কৃষি এবং তারা গ্রামনিবাসী। (Abdul Momin Chowdhury, Reflections on Islamisation in Bengal, *Bangladesh e-Journal of Sociology*, 2011)। যদি যোদ্ধা-শাসকদের সূত্রেই প্রধানত ধর্মান্তর ঘটত, তাহলে মুসলমানদের মাঝে শহুরে পেশাজীবীদের সংখ্যাও থাকত উল্লেখযোগ্য এবং তাদের অবস্থান হতো নগরগুলোতে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের দীর্ঘ সময় পরের শুমারিও সে রকম আভাস দেয় না।

৩২. তাঁর গ্রন্থ *The voyage and travaile into the East India*, London 1588. এখানে সন্দ্বীপের তথ্য উদ্ধৃত হয়েছে ইটনের গ্রন্থ থেকে। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।

৩৩. রিচার্ড এম. ইটন, *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।

৩৪. বেভারলিও ব্রিটিশদের তৈরি ১৮৭১-এর প্রথম শুমারি দলিলে বাংলার মুসলমানদের মাঝে বর্ণপ্রথার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। পৃ. ১৯০।

৩৫. মুসলমান শাসকেরা আসামাত্র যে 'গণহারে ইসলাম কায়েম' হয়নি, তার আরেক প্রমাণ ইবনে বতুতার পূর্ব বাংলা ভ্রমণের কাহিনি। এ সময় ১৫ দিন মেঘনা নদীতে ভ্রমণ শেষে নদীর দুপারে কেবল 'মুসলমান রাজত্বের অধীনে কাফের'দের দেখেছিলেন তিনি। এ বিবরণ সাক্ষ্য দেয়, অন্তত ১৪ শতাব্দীতেও এ বাংলায় অমুসলমানদের ব্যাপক আধিক্য ছিল।

'গণহারে'-এর বদলে যে 'ধীরলয়ে' বিশ্বাস বদলের ঘটনা ঘটেছে, সেটা এমনকি নদীয়ার পরের সময়ের শুমারি প্রতিবেদনগুলোতেও লক্ষ করা যায়। যেমন ১৮৭২ সালে নদীয়ায় মুসলমান জনসংখ্যার হিস্যা ছিল ৫৪ ভাগ, ১৮৯১ সালে ৫৭ ভাগ এবং ১৯০১ সালে ৫৯ ভাগ। লক্ষ করার বিষয়, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে জন্মহার বেশির বিষয় বিবেচনা করলে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে খুব ধীরলয়ে। [জেলা গেজেট নদীয়া ১৯২৭]

নদীয়ার মতোই তখনকার আরেক 'মুসলমান শাসক প্রভাবিত অঞ্চল' ঢাকায় ১৮৩০ সালের শুমারি থেকে হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যা পাওয়া যায় যথাক্রমে ৩১ হাজার ও ৩৫ হাজার। অর্থাৎ তখনো এখানে প্রায় অর্ধেক জনগণ ছিল অমুসলমান। এইচ ওয়াল্টনের উদ্যোগে শুধু ঢাকায় এই শুমারি হয়েছিল বলে জেমস ওয়াইজ জানিয়েছেন। (*পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, প্রথম ভাগ, অনুবাদ : ফওজুল করিম, আইসিবিএস, ২০০০, পৃ. ২৬)

৩৬. Asim Roy, *Islamic Syncretistic Tradition in Bengal*, Princeton University Press, 1983, p. 42.

৩৭. Sushil Chaudhury, 'Identity and Composite Culture : The Bengal Case', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Hum., Vol. 58 (1), 2013, P.3.

৩৮. রিচার্ড এম. ইটন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩-৫৪।

৩৯. H. Beverley, *Census of Bengal 1871*, Bengal Secretariat Press, 1872, P, 133.

৪০. Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872, p. 132-134 : বর্তমান লেখকের।

৪১. বেভারলি মুসলমানদের মাঝে কৃষিজীবীর পাশাপাশি তাঁতি ও জোলাদের বড় সংখ্যায় পাওয়ার তথ্য দিয়েছেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০।

৪২. একই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাংলার এসব এলাকায় একদা বৌদ্ধ বিশ্বাসেরও বিস্তৃতি ঘটেছিল বলে আব্দুল মমিন চৌধুরী দাবি করেন। সেনদের আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদী কঠোরতা এসব এলাকায় ইসলাম প্রসারের জমিন তৈরি করে রেখেছিল বলেই তিনি ইঙ্গিত দেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

৪৩. জেমস ওয়াইজ, পূর্বোক্ত, ২৩

৪৪. জেমস ওয়াইজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৪৫. এ রকমই এক গবেষণা Dhirendra Nath Majumdar and Radhakrishna Rao, *Race elements in Bengal : A quantitative analysis*, Asia Pub. House, 1960. এর মাঝে প্রথমজন ছিলেন নৃবিজ্ঞানী। দ্বিতীয়জন পরিসংখ্যানবিদ। ১৯৪৫ সালে এই জরিপ পরিচালনা করা হয় বাংলার ২৯টি জেলার ১৪টিতে ৪১টি সামাজিক গ্রুপের মাঝে। ৩৬৮১ জন পুরুষকে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। এ রকম বিষয়ে এত বৃহৎ পরিসরের ব্যবহারিক গবেষণা খুবই বিরল।

৪৬. ইটন তাঁর বিবরণে অন্যান্য পশ্চিমা গবেষকের সূত্রে দাবি করেছেন, সুলায়মান তাহির (মৃ. ৮৫১), ইবনে খুদাদাদবিহ (মৃ. ৮৫০), মাসুদি (মৃ. ৯৫৬) ও ইদ্রিসির (মৃ. ১১৫০) মতো আরবের ভূগোলবিদদের কাছে বাংলা পরিচিত ছিল এবং তাদের মধ্যে অন্তত একজন (মাসুদি) সেখানে মুসলমানদের বসবাসের উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।

৪৭. মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮১, পৃ. ৪ ও ১৩।

খাতি
সমাজ
চিন্তা

আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি সমাজের পরিবর্তন এবং এর প্রভাব

হাফিজুর রহমান কার্জন

সারসংক্ষেপ

কয়েক হাজার গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত কৃষিজ অর্থনীতির বাংলাদেশ তিন দশক ধরে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এর মধ্যেই কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারি সারা বিশ্বসহ বাংলাদেশের জন্য মহা এক সংকট তৈরি করেছে। এই মহামারির কারণে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে এবং উন্নয়নের গতি শ্লথ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মহামারির আগপর্যন্ত নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের সমাজ একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বাংলাদেশের এই উন্নয়নকে চিহ্নিত করা হয়েছে কিছু মানদণ্ড দিয়ে; যেমন মাথাপিছু গড় আয় ১৭৭২ মার্কিন ডলার; মানবসম্পদ সূচকে ৭২.৮ পয়েন্ট স্কোর; অর্থনৈতিক নাজুকতা সূচকে ২৫ পয়েন্টের নিচে স্কোর; যার ওপর ভিত্তি করে ২০১৮ সালের ১৫ মার্চ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের প্রাথমিক স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে যেখানে বাংলাদেশের বার্ষিক বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটের আকার হচ্ছে ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। এদিকে বাংলাদেশ উন্নয়ন অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) জানিয়েছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২৫ শতাংশ নাগরিক অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির বিষয়টি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি প্রামাণিক যে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের শতবর্ষী পুরোনো সমাজ 'পশ্চিমা' ধরনের আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছে। আর এই উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ, পারিবারিক কাঠামো, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। পরিবর্তনের অভিঘাত এসে লেগেছে রাজনীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক চেতনা ও সামষ্টিক বোধে। তবে এই উন্নয়নের সমান্তরালে সবচেয়ে বড় যে সর্বনাশটি হয়েছে, সেটি হচ্ছে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। রাজনীতি এমনভাবে দুর্বৃত্তায়িত ও বাণিজ্যায়িত হয়েছে যে প্রায় ৬৫ শতাংশ সাংসদ আজ ব্যবসায়ী, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশায় নিয়োজিত সবচেয়ে শিক্ষিত লোকেরা আজ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, সমাজ ও রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা আজ ভঙ্গুর ও নাজুক।

'মডারেট মুসলিম দেশ' বলে পরিচিত রক্ষণশীল মূল্যবোধের বাংলাদেশে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, ধর্ষণ, খাদ্যে ভেজাল এখন 'নর্মে' পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পথে বাংলাদেশ কতটা এগিয়েছে, সমাজ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে; সেই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবন্ধে সমাজ, রাজনীতি ও নারীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় কতটা হয়েছে, সেটিও মূল্যায়নের চেষ্টা আছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

আধুনিকায়ন, উন্নয়ন, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক পরিবর্তন, ভোগবাদ, ধর্ষণ, দুর্বৃত্তায়ন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ক্রমশ নগরায়িত ও শিল্পায়িত হচ্ছে, এ পরিবর্তনের অভিঘাত পরিলক্ষিত হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে বাংলদেশের শহরগুলোতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ লোক বাস করতেন। এখন শহরগুলোতে বাস করেন প্রায় ৩৯ শতাংশ। গত তিন দশকে তৈরি পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, চামড়াশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ যেমন হয়েছে, তেমনি রেমিট্যান্স থেকে আসছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ। সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছে সেবা খাত। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিকে ছাড়িয়ে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বেড়ে গেছে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ নিয়ে শঙ্কা ছিল, ছিল উৎকণ্ঠা। অনেক অর্থনীতিবিদ সাড়ে সাত কোটি মানুষ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারবে কি না, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। ২০২০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি, ১৯৭২ সালের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি। মাছ-মাংস, শাকসবজি ও খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে পণ্য রপ্তানিও করছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, নারীর ক্ষমতায়ন, সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ও ক্রিকেটের সাফল্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের জন্য অনন্য একটি অর্জন হচ্ছে, অনুন্নত রাষ্ট্রের অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পদমর্যাদা অর্জনের প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়া।

তবে উন্নয়ন সত্ত্বেও দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির ত্রুটির কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবহনসেবা যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, তেমনি পুলিশি সেবা ও বিচারিক সেবার অবস্থাও নাজুক। সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠা তৈরি করেছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভোগবাদী মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব, পর্নোগ্রাফির আগ্রাসন ও দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার নারীদের নিরাপত্তাকে যেমন ভঙ্গুর করে তুলেছে,

তেমনি প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রাকে করেছে কঠিন ও দুর্বিষহ। অধিকাংশ মানুষ অর্থ ও ক্ষমতার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠছে। লোভ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজের মধ্যে এক গুমোট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র কী ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, সে বিষয়ে আলোচনা আছে এ প্রবন্ধে। এ পরিবর্তনের ফলে সমাজ, রাজনীতি ও সামগ্রিক মূল্যবোধের ওপর কী কী প্রভাব পড়েছে, সে বিষয়ে থাকছে কিছু বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। করোনা সৃষ্ট মহামারির কারণে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি কমে যাবে এবং বেকারত্ব ও দারিদ্র্য ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, পরিণামে দেখা দিতে পারে বড় ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। তবে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, ধর্ষণ, লোভ যেভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে, সেই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই প্রতীয়মান হয়। করোনাভাইরাস সৃষ্ট ভয়াবহ এই সংকটের সময়েও মানহীন সুরক্ষাসামগ্রীর কারণে চিকিৎসক ও পুলিশের মৃত্যু, ব্যাপক ত্রাণ চুরি, নারী নির্যাতন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অব্যবস্থাপনা ও দুর্বৃত্তায়ন সেই অনুমিতিকেই সঠিক বলে প্রমাণ করে। মূল্যবোধের এই ভয়ংকর অবক্ষয়ের বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের চেষ্টা আছে এই প্রবন্ধে।

আধুনিকায়নের তাত্ত্বিক বয়ান ও পাল্টা বয়ান

১৯৫০-এর দশক থেকে গড়ে ওঠা আধুনিকায়নের তত্ত্ব অনুযায়ী আধুনিকায়নের তত্ত্ব হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহ্যবাহী সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। এইসেনস্টাডাট-এর (Eisenstadt) মত অনুযায়ী, 'ঐতিহাসিকভাবে, আধুনিকায়ন হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়া, যেই পরিবর্তনগুলো সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকার সময়কালে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ ও উত্তর আমেরিকায় সাধিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে এবং ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সেটি বিস্তৃত হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে।' (এইসেনস্টাডাট, ১৯৬৬)।

সহজ করে বললে, আধুনিকায়নের তত্ত্ব অনুযায়ী, উন্নয়ন হচ্ছে বিবর্তনের একটি পথ, যা (প্রায়) সব সমাজই তার কৃষিভিত্তিক, গ্রামীণ ও প্রথাগত অবস্থান থেকে শিল্প-উত্তর, নগরভিত্তিক ও আধুনিক অবস্থায় উত্তরণের জন্য অনুসরণ করে থাকে। যেসব সমাজ একদা আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে, সেসব সমাজকে উন্নয়নের পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই স্তরগুলো হচ্ছে (১) 'ট্র্যাডিশনাল' বা ঐতিহ্যগত অর্থনীতি; (২) উন্নয়নের পথে উড্ডয়ন বা যাত্রা; (৩) উন্নয়নে উত্তরণ; (৪) উন্নয়নে স্থির হয়ে পরিপক্বতা অর্জন; (৫) উঁচু ভোগের আমল; এবং (৬)

শিল্পায়ন-উত্তর সমাজ (চিরোত ও হল, ১৯৮২)।

আধুনিকায়ন তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হচ্ছে উন্নয়নের অনুঘটক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেয়, যাতে মানবসম্পদ, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সম্ভব হয় (হারকেনর‍্যাথ ও ব্রনসিয়ের, ২০০৩)। এক অর্থে আধুনিকায়নের তত্ত্ব 'মনোলিথিক, ওয়ান ওয়ে, অ্যান্ড টপ-ডাউন ডেভেলপমেন্ট স্কিম' বা একমুখী, ওপর-নিচ এবং এক শিলাস্তম্ভের মতো উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলে যা সব সময়, স্থান, প্রেক্ষিত এবং সকল ধরনের সমাজের জন্য সত্যি বলে কোনো কোনো তাত্ত্বিক মনে করেন।

আধুনিকায়নের তাত্ত্বিকেরা সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ওপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলাফল এবং শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলোর বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যয়ন করেন। মনে রাখা প্রয়োজন, আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন এবং উন্নয়ন 'ইন্টারচেঞ্জ্যাবলি' বা বদলাবদলিভাবে ব্যবহৃত হলেও এর প্রতিটিরই নিজস্ব অর্থ আছে। শিল্পায়ন আধুনিকায়নের চেয়ে সংকীর্ণ, তবে উন্নয়ন ব্যাপকতর। শিল্পায়ন বলতে সাধারণভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি, পেশার বৈচিত্র্য, মজুরি শ্রম ও আয়স্তরের প্রবৃদ্ধিকে বোঝায়। যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকায়ন হয়েছে, সেখানে শিল্পায়ন থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। আবার কোনো ধরনের আধুনিকায়ন ছাড়াও শিল্পায়ন হতে পারে (ফ্রাঙ্ক, ১৯৬৬)।

আধুনিকায়নের তাত্ত্বিকেরা উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বুঝিয়ে থাকেন এবং উন্নয়নকে মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে সংজ্ঞায়িত করেন; যদিও অন্য তাত্ত্বিকেরা উৎপাদন সক্ষমতার নিজস্ব উন্নয়ন, সম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টন, অথবা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো নিয়ে বেশি আগ্রহী। আধুনিকায়নের তত্ত্বগুলো আধুনিক সমাজের অত্যাবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অথবা বিশ্বাস-ব্যবস্থার ইহজাগতিকতার কথা বলে (ফ্রাঙ্ক, ১৯৬৬)।

যদিও আধুনিকায়নের তত্ত্বে নানা ধরনের বয়ান আছে, তবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য প্রধান ধারণাগুলো হচ্ছে (১) সমাজ বিকশিত হয় বিভিন্ন বিবর্তনের স্তরের মধ্য দিয়ে এবং এই স্তরগুলোর ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক বিন্যাসের বিভিন্ন মাত্রা ও ধরন এবং কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক উপাদানের পুনরেকত্রীকরণ, যেটি ব্যবহারিকভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ; (২) জটিল পশ্চিমা প্রযুক্তি আমদানির মধ্য দিয়ে এই আধুনিকায়ন সম্ভব হয়ে ওঠে এবং 'ট্র্যাডিশনাল' কাঠামোগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে যেগুলো এই উন্নয়নের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলো নিরসন করা সম্ভব হয়; (৩) সমসাময়িক উন্নয়নশীল সমাজগুলোর বিবর্তনের প্রাক্-আধুনিক স্তরে থাকা এবং চূড়ান্তভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা এবং পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর

আমেরিকার দেশগুলোর মতো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন (আরমের ও ক্যাটসিলিস, ২০২০)।

মোদ্দা কথা, আধুনিকায়ন তত্ত্বের অনুমিতি হচ্ছে—উন্নততর শিল্প প্রযুক্তি উন্নয়নশীল সমাজগুলোতে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই ঘটায় না, অন্যান্য কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও সাধন করে। সমাজগুলো আধুনিক হওয়ার পর যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের চেষ্টা করে, সেগুলো একটি আধুনিকায়নের তত্ত্ব থেকে আরেকটি আধুনিকায়নের তত্ত্বে স্বতন্ত্র হতে পারে; কিন্তু সাধারণভাবে আধুনিকায়নের সব তত্ত্বই বলে যে উন্নয়নশীল সমাজগুলোতে প্রতিষ্ঠানের কাঠামো এবং ব্যক্তির কর্মকাণ্ড পশ্চিমা অগ্রসর সমাজের মতো সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা ফর্মে অনেক বেশি বিশেষায়িত, পৃথকায়িত ও সমন্বিত হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক সমাজগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উঁচু পর্যায়ের নগরায়ণ, শিক্ষিতের হার, গবেষণা, স্বাস্থ্যসেবা, 'সেক্যুলারাইজেশন' বা ইহজাগতিকীকরণ (উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সংবিধানে 'সেক্যুলারিজমে'র বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা), আমলাতন্ত্র, গণমাধ্যম ও গণপরিবহন সুবিধা। উল্লেখ্য, ওপরে নগরায়ণ, শিক্ষা ও গবেষণা, স্বাস্থ্যসেবা, আমলাতন্ত্র, গণমাধ্যমসহ যেসব অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও সেবার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হতে হবে মানসম্পন্ন, পরিপক্ব ও উঁচু স্তরের, নাজুক বা গণবৈরী হলে সেগুলো আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হবে না। আধুনিক সমাজগুলোতে আত্মীয়তার বন্ধন দুর্বল হবে এবং এক অথবা দুই সন্তান নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর যে নিউক্লিয়ার পরিবারপদ্ধতি সেটি প্রতিষ্ঠিত হবে। জন্ম ও মৃত্যুর হার কম হবে এবং গড় আয়ু অপেক্ষাকৃত বেশি হবে।

রাজনৈতিকভাবে, আধুনিক সমাজগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বাড়বে এবং গতানুগতিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দল, সর্বজনীন ভোটাধিকার, সেবা প্রদানকারী আমলাতন্ত্র এবং আইন প্রণয়নকারী সংসদ। অর্থনৈতিকভাবে, আধুনিক সমাজগুলোতে অধিক শিল্পায়ন, উৎপাদনের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিস্তৃত অর্থবাজারের সঙ্গে বিনিময়ভিত্তিক অর্থনীতির পুনঃস্থাপন, অধিক মাত্রার শ্রমবিভাজন, অবকাঠামো ও বাণিজ্যিক সুবিধার বৃদ্ধি এবং ব্যাপক বিস্তৃত বাজার দৃশ্যমান হয়। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা সামজিক নানা সম্পর্ক বা 'রোল রিলেশান্স'-এর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধন করে (আরমের ও ক্যাটসিলিস, ২০২০)।

স্পেনসার, ডুরখেইম ও অন্যান্য ঊনবিংশ শতাব্দীর তাত্ত্বিক থেকে উৎসারিত বিবর্তনবাদী তত্ত্বগুলো বলছে, সমাজগুলো নিচু থেকে উঁচু স্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং সহজ-সরল থেকে জটিলতর হচ্ছে। পশ্চিমা শিল্পায়িত সমাজগুলোকে প্রাক্-শিল্পায়িত সমাজের চেয়ে উচ্চতর বলে মনে করা হচ্ছে এই অর্থে যে এই

সমাজগুলো সামাজিক কর্মকাণ্ডগুলো অধিক কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষায়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুরখেইম ফরাসি বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের সমাজে যে পরিবর্তনগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে 'এ্যানোমি তত্ত্বে'র প্রবর্তন করেন এবং এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রাক্-আধুনিক 'মেকানিক্যাল' সমাজ ও এর চেয়ে উন্নততর 'অর্গানিক' সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাক্-আধুনিক 'মেকানিক্যাল' সমাজ থেকে ফরাসি সমাজ যে নগরভিত্তিক ও শিল্পায়িত 'অর্গানিক' সমাজে বিবর্তিত হচ্ছিল, সেই আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সামাজিক মূল্যবোধের ওপর এই পরিবর্তন কী অভিঘাত তৈরি করছিল, সেটি আলোচনা করেছেন (ডুরখেইম, ১৮৯৩)।

আধুনিকায়নের অন্যান্য ধারণার মতোই স্মেলসার প্রধান চারটি পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এগুলো হচ্ছে : (১) সহজ থেকে জটিল প্রযুক্তি; (২) জীবিকা নির্বাহভিত্তিক চাষাবাদ থেকে বাণিজ্যিক কৃষি; (৩) গ্রামীণ থেকে নগরায়িত জনসংখ্যা; এবং (৪) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, প্রাণী ও মানুষের শক্তি থেকে জড় শক্তি ও শিল্পায়ন (স্মেলসার, ১৯৬৬)। ১৯৬০ সালে রোস্টো তাঁর তত্ত্বে নতুন মূল্যবোধ ও ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যেগুলো শিক্ষা ও উদ্যোক্তা আচরণের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহ প্রদান করবে (রোস্টো, ১৯৬০)।

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব, বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব এবং নব্য মার্ক্সবাদী তত্ত্বের আবির্ভাবের কারণে ১৯৬০-এর দশক থেকে আধুনিকায়ন তত্ত্বের সমর্থন কমতে থাকে। এসব তত্ত্ব আধুনিকায়ন তত্ত্বগুলোর 'এথনোসেনট্রিসিটি' বা জাতিকেন্দ্রিকতা এবং প্রভাবশালী পুঁজিবাদী স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতকে সমালোচনা করেছে। এই সব তত্ত্ব উপনিবেশীকরণ, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নব্য উপনিবেশবাদী শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বা অঞ্চলগুলোর সমসাময়িক অনুন্নয়নকে ব্যাখ্যা করে।

আধুনিকায়নের এসব বিরুদ্ধ তত্ত্বে উন্নয়ন ও অনুন্নয়নকে একই প্রক্রিয়ার অংশ বলে মনে করা হয়, যেখানে কিছু 'সেন্টার' বা কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহ 'পেরিফেরি' বা প্রান্তিক অঞ্চলকে শোষণ করে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এসব তত্ত্বের বয়ান হচ্ছে, উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন উভয়েই হচ্ছে অসম বিনিময় ব্যবস্থা এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে কাঠামোবদ্ধ সমাজগুলোর সম্মিলিত স্বার্থের ফলাফল। অনুন্নত সমাজগুলোকে 'ট্র্যাডিশনাল' বা জরাজীর্ণ না বলে এ তত্ত্বগুলো বলছে যে উন্নত ও অনুন্নত—এই উভয় সমাজই সমসাময়িক, তবে পুঁজিবাদী বিস্তৃতির অসমভাবে সম্পর্কিত অংশ (asymmetrically linked parts of capitalist expansion)।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের ভাষ্য অনুযায়ী, অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা হচ্ছে কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম সরবরাহ করা এবং শিল্পোন্নত উন্নত দেশগুলোর উৎপাদিত পণ্যের বাজার

হিসেবে কাজ করা। উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোর সঙ্গে উন্নত দেশগুলোর অসম বিনিময় সম্পর্কই উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোর স্বল্প অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণ। নির্ভরশীলতা তত্ত্বের তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকেও উন্নত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলো তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি অথবা তাদের সমৃদ্ধ অবস্থা ধরে রাখার কাজে ব্যবহার করে। তাঁদের মতে, গবেষণা শিল্পায়িত রাষ্ট্রগুলোতেই ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং অধিকাংশ গবেষণা এই রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থেই পরিচালিত হয় (সারাম (Shrum), ২০০১)।

শিল্পায়িত 'কেন্দ্রীয়' রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দরিদ্র 'প্রান্তিক' এবং 'আধা-প্রান্তিক' রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব দেখাতে চেষ্টা করে যে 'প্রান্তিক' এবং 'আধা-প্রান্তিক' রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব ব্যবস্থায় কী রকম অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে। উঁচু স্তরের অর্থনৈতিক বৈষম্য, সংকুচিত গণতন্ত্র এবং স্বল্প অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি—এই বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে 'পেরিফেরি' বা প্রান্তের রাষ্ট্রগুলোকে শনাক্ত করা যায়। কিছু রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর অতি মুনশিয়ানা বা 'ওভার স্পেশালাইজেশন', বহিঃস্থ সংস্থাগুলোর অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক প্রভাব এবং পুঁজির স্থানীয় প্রতিনিধিদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে প্রান্তের রাষ্ট্রগুলো এ দুরবস্থার শিকার হয় (সারাম, ২০০১)।

১৯৭০-এর দশকে 'ইন্টারমিডিয়েট টেকনোলজি' বা মধ্যবর্তী প্রযুক্তির কথা বলা হতে থাকে, যা ছোট আকারের শ্রমঘন প্রযুক্তি স্থানীয় বা উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদনের কথা বলে; কিন্তু জটিল, আমদানীকৃত পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করে; কেননা, যেসব পণ্য জটিল ও সূক্ষ্ম প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন করা হয়, তার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব শিল্পোন্নত উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দখলে এবং এই সব পণ্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতে রপ্তানি করে উন্নত রাষ্ট্রগুলো বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে (সাচুমাচের (Schumacher), ২০১০)। ১৯৯০-এর দশকে তাত্ত্বিকেরা আরও বৈপ্লবিক অবস্থান গ্রহণ করে বলতে শুরু করেন যে পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হচ্ছে প্রান্তের অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার।

এই যুক্তিতর্কগুলো নির্ভরশীলতা তত্ত্বের মার্ক্সিস্ট সংশ্লিষ্টতার চেয়ে অনেক বেশি সম্পর্কিত বাস্তুসংস্থান ও নারীবাদী চিন্তা চেতনার সঙ্গে। বন্দনা শিবা ১৯৮৯ সালে বলেন, পশ্চিমা বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে খণ্ডতাবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক (reductionist and patriarchal in orientation)। 'অ-পশ্চিমা বিজ্ঞান' ও 'নিজস্ব জ্ঞান'কে ('Indigenous knowledge' and 'non-Western science') প্রস্তাব করা হয় (পশ্চিমা) জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদর্শিক ও টেকসই বিকল্প হিসেবে (শিব, ১৯৮৯)।

লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, তাত্ত্বিক ও 'এমপিরিক্যাল' দুর্বলতার কারণে ১৯৭০-এর দশক থেকে সমাজতত্ত্বে আধুনিকায়ন তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকে। এতদসত্ত্বেও

এখন পর্যন্ত নীতিনির্ধারক, সরকারি কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে যাঁরা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের কাছে আধুনিকায়ন একটি প্রভাবশালী তত্ত্ব। এরই ধারাবাহিকতায় সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের নানা সূচক যেমন নগরায়ণের স্তর, শিক্ষিতের উঁচু হার, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য-পরিবহন-নিরাপত্তা ও বিচারিক সেবা, 'সেক্যুলারাইজেশন' বা ইহজাগতিকীকরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিকে প্রায়ই উন্নয়নের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের স্তর নির্ণয়

বাংলাদেশে অনুসৃত উন্নয়নপ্রক্রিয়া, বিদ্যমান পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি, মেগা প্রজেক্টভিত্তিক অবকাঠামো গড়ে তোলা, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের গতি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে নীতিনির্ধারকদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে এমন একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা, যে ধরনের উন্নত রাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপ, ব্রিটেন ও আমেরিকাতে গড়ে উঠেছে। এশিয়াতে জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে যে ধরনের উন্নত রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেটিও পশ্চিমা ধরনের।

বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে এটা প্রতীয়মান হয় না যে নীতিনির্ধারকেরা বাংলাদেশে চীন, কিউবা, উত্তর কোরিয়া বা ভিয়েতনামের মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চান। আবার এটাও মনে করার কোনো কারণ নেই যে বাংলাদেশ নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, কানাডা বা নিউজিল্যান্ডের মতো সোশ্যাল ডেমোক্রেসির কল্যাণরাষ্ট্র হতে চায়। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশে বাজার অর্থনীতি চালু রেখে জিডিপি ও গড় আয় বৃদ্ধিভিত্তিক যে উন্নয়ন অর্জনের প্রচেষ্টা চলছে, সেটি পশ্চিমের দেশগুলো যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উন্নত হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের তত্ত্বগুলোর 'লেন্স' বা আতশি কাচ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন কোন স্তরে আছে, সেটি নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

আধুনিকায়নের তাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা দেখেছি, আধুনিকায়ন বা উন্নয়ন হচ্ছে বিবর্তনের এমন একটি পথ, যা বিভিন্ন সমাজ তার গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক অবস্থা থেকে শিল্প ও নগরভিত্তিক আধুনিক অবস্থায় উত্তরণের জন্য অনুসরণ করে থাকে। আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়া সমাজকে যেসব স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেই স্তরগুলো হচ্ছে (১) 'ট্র্যাডিশনাল' বা প্রথাগত অর্থনীতি; (২) উন্নয়নের পথে যাত্রা; (৩) উন্নয়নে উত্তরণ; (৪) উন্নয়নে স্থির হয়ে পরিপক্কতা অর্জন; (৫) উঁচু ভোগের আমল; এবং (৬) শিল্পায়ন-উত্তর সমাজ।

চার থেকে পাঁচ দশক আগেও বাংলাদেশ ছিল কয়েক হাজার গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত একটি জনপদ এবং এর অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। আধুনিকায়নের বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশ ছিল 'ট্র্যাডিশনাল' সমাজ ও অর্থনীতির দেশ। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে তৈরি পোশাকশিল্পের বিকাশ, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ নারীদের ঋণ প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রেমিট্যান্সের সূত্রে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার হাত ধরে বাংলাদেশে আধুনিকায়ন বা উন্নয়নের শুরু বলে ধারণা করা যায়। নব্বইয়ের দশক থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে, যেটি অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বেই একটি ইতিবাচক প্রবণতা বলে মনে করা হয়। (২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও বিশ্বব্যাংকসহ নানা সংস্থা ও অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, এ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ১.৫ থেকে ৩/৪ শতাংশের বেশি হবে না; কেননা, করোনা মহামারি সৃষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক মাসের লকডাউনের ফলে সারা বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।)

জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিবিষয়ক কমিটি (বা ইউএন কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি) ২০১৮ সালের ১৫ মার্চ জানায়, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হওয়ার শর্তসমূহ পূরণ করেছে, যেটি চূড়ান্ত অনুমোদন পাবে ২০২৪ সালে। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অনুন্নত দেশের তালিকায় আছে। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়, আর মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে এ স্বীকৃতি প্রদান করে বিশ্বব্যাংক।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী, অনুন্নত রাষ্ট্র থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পদমর্যাদায় উন্নীত হতে হলে যে শর্তগুলো পূরণ করতে হয়, সেগুলো হচ্ছে (১) মাথাপিছু গড় আয় ১২৩০ মার্কিন ডলার বা এর অধিক; (২) মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ অথবা এর অধিক স্কোর; এবং (৩) অর্থনৈতিক নাজুকতা সূচকে ৩২ অথবা এর নিচে স্কোর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে অর্থাৎ করোনা মহামারির আগে বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৬১০ ডলার, কিন্তু জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী এটি ১২৭৪ ডলার। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ৭৩.২ এবং অর্থনৈতিক নাজুকতা সূচকে ২৫.২। এই ৩টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পদমর্যাদা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে।

এবারে দৃষ্টি দেওয়া যাক নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দিকে। ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ বাস করত শহরে। শহরবাসী মানুষের সংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ, ১৯৮৫ সালে ১৭ শতাংশ, ২০০০ সালে ২৪ শতাংশ

এবং ২০১৫ সালে ৩০ শতাংশ। ২০১৯ সাল নাগাদ নগরবাসী মানুষের সংখ্যা হয়েছে মোট জনসংখ্যার ৩৮.৬ শতাংশ (ওয়ার্ল্ডোমিটারস, ২০২০)। কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল খাত ছিল কৃষি। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের জিডিপি বা মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল ১৩.০৭ শতাংশ, শিল্পের ২৮.৫৪ শতাংশ এবং সেবা খাতের ৫২.৯৬ শতাংশ (স্ট্যাটিসটা, ২০২০)। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বা বিআইডিএসের এক গবেষণা অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার হবে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ বা এক-চতুর্থাংশ (বিআইডিএস, ২০১৫)।

নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দ্রুতগতি, জিডিপির প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু গড় আয়, মধ্যবিত্তের আকারসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশে শত বছর প্রাচীন যে 'ট্র্যাডিশনাল' বা ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও অর্থনীতি ছিল, সেটি আর নেই। ফলে 'ট্র্যাডিশনাল' সমাজ অতিক্রম করে আমরা আধুনিকায়ন বা উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়েছি। বাংলাদেশ যে উন্নয়নে স্থির হয়ে পরিপক্বতা অর্জন করেনি, সেটিও স্পষ্ট; কেননা, বাংলাদেশ পাকাপাকিভাবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পদমর্যাদা পাবে ২০২৪ সালে। উপরন্তু, একটি দেশের উন্নয়নকে তখনই শক্তিশালী ও পরিপক্ব বলা যায়, যখন সাধারণ নাগরিকদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, যোগাযোগ ও বিচারিক সেবা পাওয়া নিশ্চিত থাকে। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশে এর কোনোটিই নিশ্চিত নয়।

আধুনিকায়ন ও উন্নয়নকে কার্যকর ও অর্থবহ করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো দরকার, সেগুলো হচ্ছে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার, স্বাধীন বিচার বিভাগ, গবেষণায় সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন, কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন, নাগরিক সেবা প্রদানে সক্ষম সিটি করপোরেশন, শক্তিশালী গণমাধ্যম ও জনবান্ধব আমলাতন্ত্র ও পুলিশ। কিন্তু বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে এখনো কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি, অন্যদিকে সেবা প্রদানের দিক থেকেও প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল ও নাজুক।

উল্লিখিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ কথা বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ আধুনিকায়নের যাত্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝামাঝি অবস্থায় আছে। উন্নয়নের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ উন্নয়নের পথে যাত্রা, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে এটিতে শামিল হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় স্তর অর্থাৎ উন্নয়নে উত্তরণ, এটি এখনো হয়নি। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০২৪ সাল অব্দি মাথাপিছু গড় আয় ১২৩০ মার্কিন ডলার বা এর অধিক; মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ অথবা এর অধিক স্কোর; এবং অর্থনৈতিক নাজুকতা সূচকে ৩২ অথবা এর নিচে স্কোর ধরে রাখতে পারলে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পদমর্যাদা পাবে।

বাংলাদেশের সমাজ, মূল্যবোধ, রাজনীতি, অপরাধ ইত্যাদির ওপর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের ফলাফল

ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, কয়েক দশক আগে বাংলাদেশে যে গ্রামভিত্তিক কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির সমাজ ছিল, সেটি আর এখন নেই। শত বছরের পুরোনো বাংলাদেশের প্রথাগত সমাজ এখন উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পশ্চিমা ধাঁচের আধুনিক সমাজ হওয়ার চেষ্টা করছে। অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা সমুদ্রবন্দর, ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনের হাইওয়েসহ অনেকগুলো মেগা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো ইপিজেড বা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল নির্মাণ করা হয়েছে। ব্যবসা, বাণিজ্য ও দেশীয় উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার কমেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা এডিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ছিল মোট জনসংখ্যার ৩১.৫ শতাংশ; ২০১৬ সালে সেটি কমে হয়েছে ২৪.৩ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে সেটি ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে (এডিবি, ২০২০)।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসেবে সারা বিশ্বে যেসব রাষ্ট্র অগ্রবর্তী, সেই তালিকায় বাংলাদেশ প্রথম দিকেই আছে। ২০১৯ সালের প্রথম ৩ মাসে ৭.৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত বর্ধনশীল রাষ্ট্রগুলোর তালিকায় সপ্তম অবস্থানে আছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের বার্ষিক বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা; ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে ছিল ৪ হাজার ১০৮ কোটি টাকা; ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ছিল ১২ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা; ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৪৪ হাজার ৮৫৪ কোটি টাকা; ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১ লাখ ১৩ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। যে দেশটির প্রথম অর্থবছরের বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ হাজার কোটি টাকা, ৪৯ বছর পরে সেই দেশের বার্ষিক বাজেটের আকার ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কী পরিমাণে বেড়েছে।

উন্নয়ন, আধুনিকায়ন (ও বিশ্বায়নের) ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতিতে নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। পশ্চিমা ধাঁচের উন্নয়ন ঘটানো ও বাজার অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশে পুঁজিবাদী বিকাশের চেষ্টা হচ্ছে; সঙ্গে শুরু হয়েছে ভোগবাদের চর্চা ও বিস্তৃতি। বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, পুঁজিবাদ ও ভোগবাদ এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের চেষ্টা বাংলাদেশের রাজনীতি, অপরাধ, সমাজ ও মূল্যবোধের ওপর কী কী প্রভাব তৈরি করেছে এবং করছে, সে বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

(১) বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ তাঁর নিজ জেলা কিশোরগঞ্জে এক বক্তৃতায় বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যবসায়ীদের পকেটে ঢুকে গেছে'। ওই একই মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা ব্যবসায়ীদের হাতে সংসদীয় রাজনীতি অস্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, উন্নত দেশে অধিকাংশ আইনপ্রণেতা আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯০ শতাংশ আইনপ্রণেতা আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নেন বলে তিনি উল্লেখ করেন (লিটন, ২০১৫)। পুঁজিবাদ ও ভোগবাদের বিস্তৃতির ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি যেমন দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে, তেমনি আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সংসদের রাজনীতিক ও সাংবিধানিক চরিত্রের বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে।

অধিকাংশ সাংসদ ব্যবসায়ী হওয়ায় বিভিন্ন বিল নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয় না; আর যেসব বিলের ওপর অলোচনা হয়, সে অলোচনাটি হয় অপর্যাপ্ত, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ; কেননা, ব্যবসায়ী সাংসদেরা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও আইনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থের বাইরে রাষ্ট্র, সমাজ ও জনগণের ন্যায্য দাবিদাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী হন না। উদাহরণ হিসেবে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর কথা উল্লেখ করা যায়। কেননা, এই আইনে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পরিবহনমালিকদের জন্য যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে, সেটি যাত্রীসাধারণ তথা জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়। অথচ ভারতে সড়ক আইন ও পরিবেশ আইনে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং পরিবেশদূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

সংসদে উপস্থিত থাকা ও আইন প্রণয়নের চেয়ে ব্যবসা, বাণিজ্য, সরকারি খয়রাতি পণ্য বিতরণ, টেন্ডার ও নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা ধরনের কাজ যেখানে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়, সেসব কর্মকাণ্ডেই অধিকাংশ সাংসদের আগ্রহ ও কর্মব্যস্ততা দেখা যায়। উপরন্তু রয়েছে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ এবং মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত জবাবদিহি ও ক্যাবিনেটের সামষ্টিক জবাবদিহির বিধানের অনুপস্থিতি। এসব কারণে বিল আইনে তৈরি করার পুরো বিষয়টি 'হ্যাঁ-না ভোটের একটি মামুলি' প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত ৩০০ জন সাংসদের মধ্যে ১৮২ জন হচ্ছেন ব্যবসায়ী, যেটি মোট সাংসদদের ৬১ শতাংশের অধিক (সুজন, ২০১৯)। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যাঁরা নির্বাচিত হতেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন আইনজীবী,

শিক্ষক, চিকিৎসক ও পূর্ণকালীন রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সামরিক শাসকদের হাতে যাওয়ার পর থেকে ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অশুভ প্রবণতা শুরু হয়। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে আসতে শুরু করেন।

১৯৫৪ সালে অখণ্ড পাকিস্তানে যে নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচনে নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে ব্যবসায়ী ছিলেন মাত্র ৩ শতাংশ। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১৩ শতাংশ ছিলেন ব্যবসায়ী। ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সাংসদদের ৩৪ শতাংশ ছিলেন ব্যবসায়ী, ১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনে ছিলেন ৪৮ শতাংশ, ২০০১ সালের অষ্টম সংসদে ৫১.১ শতাংশ এবং ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবসায়ী ছিলেন ৬৩ শতাংশ (লিটন, ২০১৫)। এ তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলা যায়, আশির দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংসদের 'কমার্শিয়ালাইজেশন' বা বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি কর্তৃক নবম সংসদের ১৪৯ জন সাংসদের ওপর করা এক জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, ৯৭ শতাংশ সাংসদ 'নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে'র সঙ্গে জড়িত এবং ৭০ শতাংশ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। টিআইবি প্রদত্ত 'নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে'র তালিকায় রয়েছে (১) প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড প্রভাবিত করা; (২) স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করা; (৩) 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট' বা সরকারি সংগ্রহকে প্রভাবিত করা; (৪) উন্নয়ন বরাদ্দের অপব্যবহার; (৫) অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতা অথবা সমর্থন; (৬) মিথ্যা বিবৃতির মাধ্যমে সরকারি প্লট আত্মসাৎকরণ ইত্যাদি। সাংসদেরা যেসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেগুলোর মধ্যে ছিল হত্যা, জমি ও নদী দখল, চাঁদাবাজি, প্রতারণা ও টেন্ডারবাজি। সবচেয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতো বিষয় ছিল, সাংসদেরা তাঁদের কর্মসময়ের শতকরা ৯ শতাংশ ব্যয় করেন আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কাজে, যেটি সাংসদ হিসেবে তাঁদের মূল কাজ (টিআইবি, ২০১২)।

ওপরের তথ্য-উপাত্ত থেকে এ মন্তব্য করা যেতে পারে, মুক্তবাজার অর্থনীতির হাত ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভোগবাদের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতি দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে এবং সংসদ বাণিজ্যায়িত হয়েছে। ফলে রাজনীতি থেকে আদর্শ, কমিটমেন্ট, মূল্যবোধ—এ বিষয়গুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রফিট বা লাভকেন্দ্রিক বাজার অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনোনয়ন-বাণিজ্য ও নির্বাচন-বাণিজ্যও ফুলে-ফেঁপে উঠছে। উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির যে আদর্শচ্যুতি এবং বাণিজ্যায়ন, সেটির কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে

না। প্রণীত আইন যেমন নিম্নমানের ও ত্রুটিপূর্ণ হচ্ছে, তেমনি সংসদীয় কমিটিগুলো প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি করতে পারছে না, যেটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক জবাবদিহির মূল বিষয় বলে মনে করা হয়।

(২) উন্নয়নের সঙ্গে বাড়ছে অর্থ পাচার, খেলাপি ঋণ, দুর্নীতি ও সাইবার অপরাধ

প্রথাগত বাংলাদেশি সমাজে যেসব অপরাধ সংঘটিত হতো; যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যাকাণ্ড—এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের অপরাধ দেখা যাচ্ছে; যেমন বিদেশে অর্থ পাচার, দেশীয় নারীদের দ্বারা তৈরি পর্নোগ্রাফি, দুর্নীতি ও মাদকের বিস্তার, সাইবার অপরাধ ইত্যাদি। উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বেড়েছে; এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ব্যাংক, বাণিজ্য, অর্থ ও স্টক মার্কেটসংক্রান্ত অপরাধ। রপ্তানিমুখী নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে যাওয়ায় বিদেশিরাও বাংলাদেশে কাজ করছেন। পর্যাপ্ত সরকারি তদারকির অভাবে বিদেশিরা টাকা পাচারসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন।

'বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থান : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে টিআইবি জানিয়েছে, বাংলাদেশে বৈধ-অবৈধভাবে কর্মরত প্রায় আড়াই লাখ বিদেশি কর্মী দেশের বাইরে বছরে প্রায় ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা পাচার করছেন। গবেষণা প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, মাসিক গড় বেতন দেড় হাজার মার্কিন ডলার ধরে হিসাব করলে বিদেশি কর্মীদের বার্ষিক আয় ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈধভাবে বিদেশে পাঠানো হয়; বাকি অর্থ অবৈধভাবে বিদেশে পাচার হয়ে যায়, টাকার অঙ্কে যা প্রায় ২৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা; ফলে সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতি হয় ১২ হাজার কোটি টাকা (টিআইবি, ২০২০)।

বাংলাদেশে কাজ করতে আসা বিদেশিদের ৫০ শতাংশই ভ্রমণ ভিসায় আসেন। তাঁরা কাজ জোগাড় করে দেশে ফিরে যান, পরে আবার ভ্রমণ ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। টিআইবি তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে জানায়, বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে নেই, ফলে বিদেশি কর্মী নিয়োগে নেই কোনো সমন্বিত ও কার্যকর কৌশলগত নীতিমালা। বাংলাদেশে এখন ৪৪টি দেশের নাগরিকেরা কাজ করছেন। এ দেশগুলোর মধ্যে আছে চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, নরওয়ে ইত্যাদি।

অর্থসংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য-উপাত্ত দেওয়া হলে বোঝা যাবে, ব্যবসা, বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে অর্থসংক্রান্ত অপরাধ বেড়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ড বা

গোপন অর্থনীতির ওপর ২০১১ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে কালোটাকার পরিমাণ জিডিপির ৪৫ থেকে ৮১ শতাংশ (অর্থাৎ ১১০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত)। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ১৪ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে (তাসনিম, ২০১৩)।

২০০২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের অডিটর ও কম্পট্রোলার জেনারেল একটি প্রতিবেদন পেশ করেন, যেখানে উল্লেখ করা হয়, বিগত ৭ বছরে বাংলাদেশ সরকারের ২৪ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ১৫ হাজার কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। ২০১৯ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক হাইকোর্টের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করে, সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে প্রথম স্টক মার্কেটে ধস নামে, যাতে প্রায় ৩ লাখ ছোট ও মাঝারি বিনিয়োগকারী তাঁদের মূলধন হারান। ২০১১ সালে আবার স্টক মার্কেটের পতন হয়, যাতে ৩৫ লাখ বিনিয়োগকারী তাঁদের মূলধন হারান। কয়েকজন দুর্বৃত্ত স্টক মার্কেট ম্যানিপুলেট করে সাধারণ জনগণের ৩০ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, চিকিৎসক, ছোট-বড় ব্যবসায়ীসহ বিপুলসংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। অর্থনীতিবিদ খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদন দিলেও প্রতিবেদনে উল্লেখিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল—এই ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ ৬ হাজার ৩০৯ কোটি ডলার, যা টাকার অঙ্কে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও করপোরেট সেক্টরের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বাড়ছে হোয়াইট কলার ক্রাইম, করপোরেট ক্রাইম ও সাইবার ক্রাইম। পাসওয়ার্ড হ্যাকিং, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, সাইবার বুলিংসহ নানা ধরনের নতুন নতুন অপরাধের উপদ্রব ও বিস্তার দেখা যাচ্ছে। মুঠোফোন ও ফেসবুক ব্যবহার করে এমন সব নতুন ধরনের অপরাধ হচ্ছে, যার ভয়াবহ শিকার হচ্ছে নারীরা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানও নানা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ২০১৬ সালে হ্যাকাররা খুব সূক্ষ্ম ও সুসংগঠিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০০ মিলিয়ন ডলার চুরি করে নিয়ে যায়।

(৩) বাংলাদেশের সমাজ ও মূল্যবোধের ওপর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নপ্রক্রিয়ার প্রভাব

এ ব্যাপারে দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই, আধুনিকায়ন ও উন্নয়নপ্রক্রিয়ার সঙ্গে

সংযুক্ত হয়ে বেশ কিছু ইতিবাচক অর্জন বাংলাদেশের হয়েছে; যেমন মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্যবিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনযাত্রার মানে উন্নতি, অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর একটি স্তর গড়ে তোলা, সবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি, তৈরি পোশাকশিল্প, ইপিজেড, শিল্প ও সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি। এসব অর্জন না হলে হেনরি কিসিঞ্জার বর্ণিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র বাসিন্দারা খেয়ে-পরেই বেঁচে থাকতে পারতেন কি না সন্দেহ, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হওয়া তো অনেক দূরের কল্পনা!

তবে যে বিষয়টি উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার সেটি হচ্ছে, উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে দুর্নীতি, বিস্তৃত হচ্ছে মাদকের ব্যবহার, বাড়ছে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা; পুঁজিবাদ ও ভোগবাদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে মানুষের লোভ, মূল্যবোধের ভয়ংকর অবনতি হয়েছে এবং হচ্ছে; ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে শত বছরের পুরোনো সামাজিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে যে একটি নিয়ন্ত্রণ ছিল; যে প্রতিষ্ঠানগুলো দিয়ে সমাজের মানুষের লোভ, দুর্নীতি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো; সেই প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে।

তিন দশক আগেও কি আমরা চিন্তা করতে পারতাম, বাংলাদেশে গণধর্ষণ হবে? ৫-৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হবে? দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে আজ গণধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণ বাংলাদেশে একটি স্বাভাবিক ঘটনা, বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়! বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ১৭৬টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়, এবং ২০১৯ সালের পুরো বছরে ধর্ষণের শিকার হয় ১ হাজারের বেশি শিশু। কী ভয়াবহ তথ্য! ২০১৮ সালে গড়ে প্রতি মাসে ৫৫টির বেশি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, আর ২০১৯ সালে প্রতি মাসে হয়েছে ৮৪টি শিশু। ১৭৬টি শিশুর মধ্যে ৮ জন প্রতিবন্ধী এবং ২০টি শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়। ২৫টি শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় এবং ৩টি শিশু আত্মহত্যা করে (*প্রথম আলো*, ২ এপ্রিল ২০১৮)।

ধর্ষণের শিকার ১৭৬টি শিশুর মধ্যে ১৫ জনের বয়স ১-৬ বছরের মধ্যে, ৩৭ জনের বয়স ৭-১২ বছরের মধ্যে, ৫৭ জনের বয়স ১৩-১৮ বছরের মধ্যে। মূল্যবোধের অবক্ষয় কতটা ভয়াবহ হলে একজন পুরুষ ১ থেকে ৭/৮ বছরের একটি কন্যাশিশুকে ধর্ষণের কথা ভাবতে পারে! বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল মূল্যবোধের ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশে কী করে শত শত গণধর্ষণ হয়? বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৭ সালে ২২৪ জন নারী ও শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়, আর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৩২৭টি।

দুর্নীতি কতটা মহামারির আকার ধারণ করলে একটি দেশ পাঁচ-পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারে? ভোগবাদ ও বৈষয়িক চিন্তা কতটা সর্বগ্রাসী হলে একটা দেশের প্রায় সবাই টাকা ও ক্ষমতার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে? গণধর্ষণ, শিশু ধর্ষণ, দুর্নীতি, ভোগবাদী প্রবণতা ও লোভের বিস্তার আমাদের শ্রেয়বোধ, নৈতিকতার বুনন, ন্যায়পরায়ণতার বোধ ও মঙ্গলচিন্তাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। একই সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছে আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ভয়ংকর চিত্রটি।

নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নয়নের হাত ধরে নাগরিকেরা ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর হয়ে উঠছেন। মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিশ্লেষকেরা বলছেন, ব্যস্ত জীবনের অভিঘাতে মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে যাচ্ছেন, সামাজিক বন্ধন শিথিল থেকে শিথিলতর হচ্ছে। পুঁজিবাদ ও ভোগবাদের কারণে মানুষের লোভ বেড়ে যাচ্ছে, মানুষ হয়ে যাচ্ছে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের সামষ্টিক এবং সামগ্রিক কল্যাণ নিয়ে তাঁরা চিন্তা করছেন না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার যে সহজাত প্রবণতা বাংলাদেশের মানুষের ছিল, সেটি হারিয়ে যেতে বসেছে। সিলেটে খাদিজাকে মাটিতে ফেলে বদরুল যখন রামদা দিয়ে কোপাচ্ছিলেন, তখন খাদিজাকে উদ্ধার করতে কেউ অগ্রসর হননি, বরং অনেকেই মোবাইলে ওই দৃশ্যের ছবি তুলছিলেন অথবা ভিডিও করছিলেন।

পিরোজপুরে রিফাতকে যখন প্রকাশ্যে রামদা দিয়ে কোপানো হচ্ছিল, তখন তাঁর স্ত্রী মিন্নি ছাড়া কেউ তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে যাননি। ফলে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে রিফাতের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-সংলগ্ন গেটের কাছে অভিজিৎকে শত শত লোকের সামনে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। উপস্থিত লোকজন বা পুলিশ কেউ তাঁর সহায়তায় এগিয়ে যাননি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে প্রকাশ্যে দরজির দোকানি বিশ্বজিৎকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ভিডিওতে ধারণ করা মর্মান্তিক সেই দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। সিলেটে ১৩ বছরের বালক রাজনকে চুরির অপবাদে অনেক মানুষের সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হলেও তাকে বাঁচাতে কেউ সাহস করে এগিয়ে যাননি। এ রকম ঘটনাসমূহ উদ্ধৃত করে মোটামুটিভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেটি হচ্ছে আধুনিক (ও উন্নত) হওয়ার প্রতিযোগিতায় ছুটতে থাকা বাঙালির নৈতিকতা বোধ, সোশ্যাল কমিটমেন্ট ও প্রতিবাদী চেতনা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে।

উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে গড়ে ওঠা নগরসমূহের পরিবার সমষ্টিতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে; সেই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে ব্যক্তিমানুষের আচরণ, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক, বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, অপরাধ, সহিংসতা ইত্যাদিতে। একসময়ের যৌথ পরিবার, যেটি ছিল শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার নিরাপদ আশ্রয় ও ভরসাস্থল, সেটি অনেকটা বিলীন হওয়ার

পথে। যৌথ পরিবারের স্থান নিয়েছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বা পারমাণবিক পরিবার, মা-বাবা ও এক ছেলে এক মেয়ের সমন্বয়ে গঠিত ছোট ছোট পরিবার। এতে অনেক শিশু-কিশোরের মধ্যে বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে উঠছে না; অনেকে সামাজিক বন্ধনের গুরুত্ব বুঝতে পারছে না; ছোট ছোট পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তারা হয়ে যাচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে যাচ্ছে সংকীর্ণ। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার পাশাপাশি বাড়ছে বিবাহবিচ্ছেদ।

২০১৭ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন বলছে, গত এক দশকে বিবাহবিচ্ছেদ এবং স্বামী-স্ত্রীর আলাদা থাকার হার আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৬ সালে প্রতি হাজারে বিবাহবিচ্ছেদের হার ছিল ০.৬, কিন্তু ২০১৬ সালে সেটি বেড়ে হয়েছে ১.১ জন; আর স্বামী-স্ত্রীর আলাদা থাকার হার ০.২ থেকে বেড়ে ০.৬ হয়েছে (বিবিএস, ২০১৭)। বিবাহবিচ্ছেদ এবং স্বামী-স্ত্রীর আলাদা থাকার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'লিভ টুগেদার'-এর হারও বাড়ছে। প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধ শিথিল হওয়া, নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে পশ্চিমা মূল্যবোধের প্রভাব এবং শহুরে অ্যাপার্টমেন্টগুলোর 'লাইফ অব অ্যানানিমিটি'র সুযোগে বাড়ছে বিবাহবহির্ভূত মেলামেশা এবং 'এলিট প্রস্টিটিউশন'-এর হার।

বিবাহ নিবন্ধনকারী, মনোবিজ্ঞানী ও 'জেন্ডার এক্সপার্ট'দের উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনে বলা হয়, পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়া, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও নানাজনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক, ভার্চুয়াল জগৎ, স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারীদের বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার কারণে বিবাহবিচ্ছেদ ও আলাদা থাকার হার বাড়ছে (বিবিএস, ২০১৭)।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে 'মানুষের মতো মানুষ হওয়া' এখন আর ব্যক্তির লক্ষ্য নয়, এখন তার লক্ষ্য অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া। আদর্শ, মূল্যবোধ, সততা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা ইত্যাদি এখন একাডেমিক আলোচনা ও শ্রেণিকক্ষের বক্তৃতার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, বাস্তব জীবনে চর্চার বিষয় আর থাকছে না। লুটেরা পুঁজির বিকাশ এবং ভোগবাদী সংস্কৃতির বিস্তৃতির কারণে ব্যক্তিনির্বিশেষে প্রায় সবার মধ্যে টাকা উপার্জন ও ক্ষমতার জন্য প্রবল তাড়না দৃশ্যমান হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে কোটিপতি অ্যাকাউন্টধারী ব্যক্তি ছিলেন মাত্র ৫ জন। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর নাগাদ কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৩৬১ জনে (*মানবজমিন*, ২০১৭)। সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বৃদ্ধির সঙ্গে কোটিপতির সংখ্যার উল্লম্ফনের সম্পর্ক আছে বলে অনেকে মনে করেন। আর বৈধ-অবৈধ যেকোনোভাবে অর্থ উপার্জনের এই প্রবণতার কারণে সমাজের

সর্বত্র অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক অস্থিরতা, ভোগবাদ ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, মহামারির আকার ধারণ করা ধর্ষণ, হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদর্শচ্যুতির মধ্য দিয়ে।

দুর্নীতির ব্যাপারে তথ্য-উপাত্ত দেওয়াটা বাহুল্য। আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে সবচেয়ে শিক্ষিত লোকেরাই সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। এই তালিকায় আছেন সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, উপাচার্য, সামরিক ও বেসামরিক আমলা, মন্ত্রী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। টাকা ও ক্ষমতার জন্য শিক্ষিত মানুষ কী রকম উন্মাদ হয়ে উঠেছেন, দু-চারটি উদাহরণ দিলে সেটি স্পষ্ট হবে। চারজন সচিব তাঁদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য মুক্তিযোদ্ধার সনদ জাল করে সরকারি দপ্তরে জমা দিলে বিষয়টি তদন্ত করার পর সরকার চার সচিবের মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বিদেশি অতিথিদের দেওয়া সংবর্ধনার ক্রেস্টের সোনায় ভেজাল দেওয়া নিয়ে খবর প্রকাশিত হলে বোঝা গিয়েছিল যে নৈতিকভাবে আমরা কতটা অধঃপতিত হয়েছি।

এ ব্যাপারে *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক ও সংগঠনকে সম্মাননার সময় দেওয়া ক্রেস্টে ১ ভরি সোনা দেওয়ার কথা থাকলেও তাতে ১২ আনাই নেই। আর ক্রেস্টে রুপার বদলে দেওয়া হয় পিতল, তামা ও দস্তামিশ্রিত সংকর ধাতু। এমন একটি লজ্জাজনক কেলেঙ্কারিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও সচিবের সংশ্লিষ্টতার খবর প্রকাশিত হলেও শেষ পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

২০১৯ সালে দুটি দুর্নীতির খবরে সমগ্র বাংলাদেশের নানা মহলে ব্যাপক সমালোচনা দেখা দেয়, খবর দুটি হচ্ছে (১) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের গ্রিন সিটিতে একটি বালিশ কিনতে লেগেছে ৫ হাজার ৯৫৭ টাকা। আর ভবনের ওপরে ওঠাতে প্রতিটি বালিশের জন্য বিল করা হয়েছে ৭৬০ টাকা। (২) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আইসিইউর জন্য কেনা একটি পর্দার দাম দেখিয়েছে ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

গত এক দশকে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈতিকতার অবনমনের কারণে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে ধর্ষণ। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৩০ লাখ এবং এই সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ বছরে (২০১৪-২০১৮) ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা এবং ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার হয়েছেন

প্রায় ৪ হাজার নারী ও শিশু, যাঁদের মধ্যে ৮৬ শতাংশই শিশু অথবা সদ্য যুবতী। ধর্ষণজনিত হত্যার শিকার নারীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই বয়সী। পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাবে উল্লেখিত ৫ বছরে ধর্ষণের মামলা হয়েছে ১৯ হাজারের অধিক। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা ও ধর্ষণজনিত হত্যার শত শত ঘটনা আমলে নিলে এ কথা বলতে হয়, বাংলাদেশের সভ্যতার স্তর লজ্জাজনকভাবে নিচু এবং সেই সূত্রে মূল্যবোধের অবনতির চিত্রটিও ভয়াবহ।

বাংলাদেশের সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণের ঘটনা আগেও ঘটত। তবে গণধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণ, বিশেষ করে যেসব কন্যাশিশুর বয়স ৩/৪ থেকে ৯/১০ বছর, তাদের ধর্ষণের কথা শোনা যেত না। কিন্তু গণধর্ষণ ও কোমলমতি কন্যাশিশু ধর্ষণের যে অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে এটি স্পষ্ট, বাংলাদেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈতিকতার ধস তলানিতে এসে ঠেকেছে।

চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে সারা দেশে ২৮ জন প্রতিবন্ধী শিশুসহ ৫৭১ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। 'শিশু অধিকার সংরক্ষণে ২০১৮-এর পরিস্থিতি, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, চাইল্ড পার্লামেন্টের জরিপ অনুযায়ী, ৮৭ শতাংশ শিশুই কোনো না কোনো যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। গণপরিবহনেই নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৫৩ শতাংশ। রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এমনকি পরিবারেও শিশুরা যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছে।

মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের ফলে দুর্নীতি, শিশু ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা যখন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সমাজ যেমন তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে এ মহামারি মোকাবিলা করতে পারছে না, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতাও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। ২০০১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সারা দেশের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আসা ধর্ষণ মামলায় ৪ হাজার ৫৪১টি মামলা হয়েছে, যার মধ্যে শাস্তি হয়েছে মাত্র ৬০টি মামলায়। ১৫ বছরে (২০০২-২০১৬) ঢাকা জেলার ৫টি নারী নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে আসা ধর্ষণসংক্রান্ত মামলার সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে দৈনিক *প্রথম আলোর* প্রতিবেদকেরা দেখতে পেয়েছেন, নিষ্পত্তি হওয়া মামলায় ৩ শতাংশ ধর্ষক শাস্তি পেয়েছেন। তার মানে, ধর্ষণ মামলায় কনভিকশন রেট হচ্ছে মাত্র ৩ শতাংশ! (*প্রথম আলো*, সেপ্টেম্বর ২০১৭)।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র অপবাদ দিয়ে তলানিতে ফেলে রাখা, এবং 'পেরিফেরাল কান্ট্রি'র তকমা দিয়ে নয়া উপনিবেশ

বা প্রান্তিক রাষ্ট্র করে রাখার নানা তৎপরতা ছিল। তবে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হয়েছে, তাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তবে এত অর্জনের পরেও সুষম বণ্টন না হওয়ায় বাড়ছে বৈষম্য, সুশাসন না থাকায় লুটপাট হচ্ছে হাজার কোটি টাকা, নৈতিক মানের ধসের কারণে বাড়ছে দুর্নীতি এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা। উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন কাঙ্ক্ষিত ও ফলপ্রদ হলেও মূল্যবোধের যে ভয়াবহ অবনতি হয়েছে, সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে পারে। টাকা ও ক্ষমতার জন্য মানুষের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাদের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে লোভের বল্গাহীন হয়ে ওঠা এবং ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত হত্যার মহামারির আকার গ্রহণ করা চরম সামাজিক অবক্ষয় ও অন্তর্গত অস্থিরতার প্রকাশ।

অর্থনীতিবিদ ও অধিকারকর্মীদের মতে, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অভাবে শিশু ও কিশোর-কিশোরীর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে নারীর এগিয়ে চলার পথ। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও গণধর্ষণ এবং হত্যা বন্ধ করা সরকার ও সমাজের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা, এর শিকড় উগ্র পুরুষতান্ত্রিকতা, নারীর প্রতি বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারীকে পণ্য বানানোর পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী আয়োজনের মধ্যে নিহিত। শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য দরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও 'অ্যাকশন প্ল্যান'।

মনে রাখা দরকার, ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারকে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কাজ করতে হবে। এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পঞ্চম লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে, নারী ও কন্যাশিশুর সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন। আর ১৬তম লক্ষ্য হচ্ছে, শিশুদের ওপর অত্যাচার, শোষণ, পাচার এবং সব ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ করা। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ ও গণধর্ষণ এবং হত্যা যেভাবে বাড়ছে, সেটি যদি বাড়তে থাকে অথবা শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা যদি নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে শুধু সামাজিক শৃঙ্খলা, ভারসাম্য ও বন্ধনই হুমকির মুখে পড়বে না; বাংলাদেশের উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হবে। কেননা, নারী ও শিশু সম্মিলিতভাবে মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেকের বেশি। বাংলাদেশের উন্নয়নে নারীদের রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফলে নারী ও শিশুর সুরক্ষার বিষয়টি শুধু সামাজিক ও আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয় নয়, বরং উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রারও একটি বড় ইস্যু।

টীকা

১. সাম্প্রতিক সময়ে সরকার বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফির সব সাইট বন্ধ করে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নানা মহল থেকে এ দাবি করা হচ্ছিল। এতে করে ক্রমশ খারাপের দিকে যাওয়া পরিস্থিতি কিছুটা হলেও উন্নত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

২. কোনো আইন পাসের আগে সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়াটি বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যাপ্ত আলাপ-আলোচনার পর বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের সমর্থন পেলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর সেটি পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হয়।

৩. ব্যবসায়ী এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলা রাজনীতিতে আসতে পারবেন না, এমন কোনো কথা নেই বা আইনে কোনো বাধাও নেই। তবে গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে এলে তাঁরা জনস্বার্থের চেয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেন। একইভাবে আমলারা রাজনীতিতে এলে তার ফলও ইতিবাচক হয় না। কেননা, সারা জীবন রাষ্ট্রীয় পদে থেকে তাঁরা নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন এবং তাঁদের জনসংশ্লিষ্টতা বলে কিছু থাকে না। এরপর অবসর জীবনে রাজনীতিতে এসে তাঁরা এমপি ও মন্ত্রী হয়ে আবার আর্থিক, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিতে থাকেন। ফলে রাজনীতিতে এর প্রভাব হয় নেতিবাচক।

তথ্যসূত্র

Akram, Shahzada M. (2012). "Positive and Negative Roles of the Members of the 9th Parliament : A Review". Transparency International Bangladesh.

Armer, J. Michael, and Katsillis, John. (2020). Modernization theory. *Encyclopedia of Sociology.* https ://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/modernization-theory

Asian Development Bank. (2020). "Poverty Data : Bangladesh". https ://www.adb.org/countries/bangladesh/poverty

Bangladesh Bureau of Statistics. (2017). 'Divorce doubles, separation triples in one decade', August 4, 2017. https ://www.thedailystar.net/frontpage/marriages-get-shaky-1443259

BIDS Study. (2015). "Size and growth of the middle class in Bangladesh : trends, profiles, and drivers". The Daily Star, 6 November, 2015.

Chirot, Daniel and Hall, Thomas D. (1982). World-System Theory. *Annual Review of Sociology*, Vol. 8., pp. 81-106.

Durkheim, Emile. (1893). *The Division of Labour in Society*. (Original book was written in French. See Emile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, Translated by George Simpson. The Free Press, New York, 1999.)

Eisenstadt, S. N. (1966). *Modernization : Protest and Change*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.

Frank, Andre Gunder. (1966). "The Development of Underdevelopment." *Monthly Review* 18(4) :17-31.

Herkenrath, M. and Bornschier, V. (2003). "Transnational corporations in world development : Still the same harmful effects in an increasingly globalized world economy?" *Journal of World Systems Research*, 9 (1), 105- 139.

Liton, Shakhawat. (2015). "Business factor in our politics : News Analysis". *The Daily Star*, October 14, 2015.

Rostow, Walt W. (1960). *The Stages of Economic Growth : A Non-Communist Manifesto.* London : Cambridge University Press.

Schumacher, E. F. (2010). *Small Is Beautiful : Economics as if People Mattered.* Harper Perennial Modern Thought.

Shiva, Vandana. (1989). *Staying Alive : Women, Ecology and Development.* Zed Books.

Shrum, W. (2001). "Science and Development." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences.* https ://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/dependency-theory

Smelser, Neil. (1966). "The Modernization of Social Relations." In Myron Weiner, ed., *Modernization : The Dynamics of Growth.* New York : Basic.

Shushasoner Jonno Nagorik (Shujan). "182 businessmen elected to parliament". *Prothom Alo* English, 7 January 2019
https ://en.prothomalo.com/bangladesh/182-businessmen-elected-to-parliament

Statista. (2020). "Bangladesh : Share of economic sectors in the gross domestic product (GDP) from 2008-2018". https ://www.statista.com/statistics/438359/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-bangladesh/# :₹ :text=In%202018%2C%20the%20share%20of,sector%20contributed%20about%2052.96%20percent.

Tasnim, Faria. (2013). "The influence of black money on economy". *The Daily Star*, June, 2013. https ://www.thedailystar.net/news/the-influence-of-black-money-on-economy

Worldometer. (2020). "Bangladesh Demographics". https ://www.worldometers.info/demographics/bangladesh-demographics/

'বাংলাদেশে বিদেশিদের কর্মসংস্থান : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়'। (২০২০)। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। https ://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/media-release/6002-2020-02-05-18-12-26

'বিদেশিদের হাতে পাচার ২৬,৪০০ কোটি টাকা : টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন', দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

'দশ বছরে পাচার ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা', বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ জানুয়ারি ২০১৯।

'ধর্ষণ বাড়ছেই, মূল শিকার কিশোরীরা', দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

'মুক্তিযোদ্ধা সনদ কেলেঙ্কারি, ডি ডব্লিউ (ডয়চে ভেলে বাংলা), ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪।
https ://www.dw.com/bn/মুক্তিযোদ্ধা-সনদ-কেলেঙ্কারি/a-17921652

'ক্রেস্টের স্বর্ণের ১২ আনাই মিছে', দৈনিক *প্রথম আলো*, ৬ এপ্রিল ২০১৪

https ://www.prothomalo.com/bangladesh/article/185914/ক্রেস্টের-স্বর্ণের-১২-আনাই-মিছে

দৈনিক *প্রথম আলো*, ৮ আগস্ট ২০১৫।

দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩০ মার্চ ২০১৬।

'বছরে ধর্ষণের শিকার ৫৭১ শিশু', দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩১ মার্চ ২০১৯।

'তিন মাসে ধর্ষণের শিকার ১৭৬ শিশু', দৈনিক *প্রথম আলো*, ২ এপ্রিল ২০১৮।

দলিলপত্র

মোগল সম্রাট কর্তৃক ঢাকায় নির্বাসিত এক রাজকুমার কবির খান খান্দেশি

মোহাম্মদ আবুল বাশার

১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের পর থেকেই এখানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় ও বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে। এ সময় এখানে দিল্লি সালতানাতের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে স্থানীয়ভাবে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ নিজেকে স্বাধীন সুলতান ঘোষণা দিয়ে পুরো বাংলা অঞ্চল শাসন করতে থাকেন, যা বিভিন্ন রাজবংশ ও সুলতানদের শাসনকর্মের মাধ্যমে মোগল আমল পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। মোগল সম্রাটদের শাসন ও দখলনীতি সকল ধর্ম ও অঞ্চলের ওপর সমানভাবে অব্যাহত ছিল। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের হাতে মধ্যভারতের খান্দেশ রাজ্য বিজিত হলে সেখানকার সুলতান বাহাদুর শাহকে বন্দী করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়।[১] এই রাজ্য পতনের পর সম্রাট আকবর ফারুকি বংশের অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন এবং বৃত্তি গ্রহণের শর্তে মোগল অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন।[২] সুলতান বাহাদুর শাহর পুত্র শাহজাদা কবির খান[৩] সম্রাট আকবরের ভূমি জায়গিরের ফরমান নিয়ে ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, কবির খানের নামানুসারে এই এলাকা উত্তরখান নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর সাদাসিধে জীবনযাপন ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং তাকওয়া পরহেজগারিতে এলাকার সব মানুষ খুবই শান্তি ও কর্মময় জীবন যাপন করতে থাকে। এ সময়েই তাঁর একটা ভক্তকুল ও শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রেণির সৃষ্টি হয়। কবির খান ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বংশধর ও প্রজাগণ মিলে তাঁর কবরকে ঘিরে দরগাহ ঘোষণা করেন, যা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত আছে। তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে অনেকেই পরবর্তীকালে বাংলা সুবা শাসনকার্যে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আঠারো/উনিশ শতকের কোনো এক সময়ে তাঁর জমিদারি বেহাত হলে বিংশ

শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁরই একজন বংশধর অবশিষ্ট কিছু জমি ওয়াক্‌ফ করে ওই সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য মোতোয়ালি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে সেই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ও দরগাহ নিয়ে উত্তরখানের বুকে শায়িত আছেন সেই মহান ব্যক্তি।

কবির খান্দেশি নামেও কবির খান পরিচিত। তাঁর পিতার নাম বাহাদুর শাহ (কাদের খান), মাতার নাম ও জন্মতারিখ অজ্ঞাত। খান্দেশি তাঁর বংশীয় উপাধি। তিনি খান্দেশে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় নামের শেষে খান্দেশি উপাধি ধারণ করেন। তাঁর বংশধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, খান্দেশ নামক অঞ্চল ছিল বর্তমান ভারতের মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যকার বিস্তীর্ণ এলাকা। এটি তাপ্তি বা তাপি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত।[৪] খান্দেশ ভারতের ডেকান মালভূমির উত্তর-পশ্চিম কোণে মধ্যভারতে তাপি নদীর দুপাশে অবস্থিত। এর উত্তরে সাতপুরা রেঞ্জ, পূর্বে বেরার (ভারহাদ অঞ্চল), দক্ষিণে অজন্তা পাহাড় এবং পশ্চিমে পশ্চিম ঘাট। তাপি নদীর উত্তর পাশে খান্দেশের রাজপরিবারের বসবাস ও অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হওয়ায় এটাই মূল স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ছাড়া তৎকালীন পুরো ভারতীয় অঞ্চলের দ্যক্ষিণাত্যের শাসনকার্য চালানোর জন্য খান্দেশ অঞ্চলটি প্রবেশদ্বার হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করত। এ রাজ্যের শাসকদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১২৯০ সালে দিল্লির সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ খিলজি (১২২০—১২৯৬) চৌহান রাজবংশের হিন্দু রাজাকে পরাজিত করলে প্রথম এই রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে।[৫] ১৩৭০ খ্রিষ্টাব্দে এ রাজ্য তুর্ক-আফগানি শাসকদের অধীনে আসে এবং সেখানে মালিক আহমদ খান রাজা ক্ষমতারোহণ করেন। এরপর তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের (রা.) বংশধর হিসেবে ফারুকি রাজবংশের সূচনা করেন।[৬] পরবর্তী প্রায় ২০০ বছর পর তাঁদেরই বংশধর সুলতান রাজা আলী খান ওরফে চতুর্থ মিরান আদিল খান আদিল শাহ নাম ধারণ করে নতুন রাজবংশের সূচনা করেন। এ রাজবংশের সর্বশেষ শাসক সুলতান বাহাদুর শাহ সম্রাট আকবরের কাছে পরাজয়ের পরই এ রাজ্যে রাজবংশের ধারাবাহিকতা শেষ হয়। মোগল সম্রাট আকবর খান্দেশ দখল করার পর আরও কিছু অঞ্চল যোগ করে তাঁর পুত্র দানিয়েলের নাম যুক্ত করে দান্দেশ নামে প্রদেশ ঘোষণা করেন।[৭] খান্দেশ অঞ্চলটি ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের বোম্বে প্রদেশের বোম্বে রাজ্য এবং ১৯৬০ সালে ভাষাগত কারণে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে বিভক্ত হয়। পূর্ব খান্দেশ জলগাঁও জেলা এবং পশ্চিম খান্দেশ ধুলে জেলা হিসেবে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। ধুলে জেলা ভাগ হয়ে নন্দুরবাগ জেলা নামে নতুন জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর বর্তমানে বুরহানপুর জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

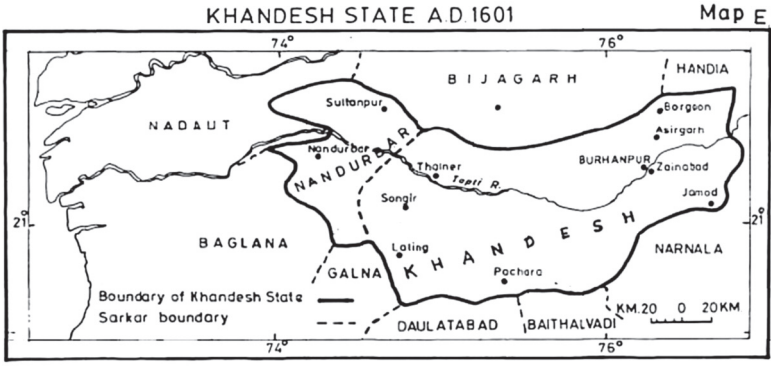

সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা অধিকার করেন।[৮] তিনি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে খান্দেশ রাজ্য ও তার রাজধানী বুরহানপুর দখলের আগে এ রাজ্যের সেনানিবাস তথা আসিরগড় দুর্গ দখল করেন।[৯] যার ফলে নিরুপায় হয়ে খান্দেশ সুলতান বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করেন। আসিরগড় দুর্গটি অধিকার করার পর সেখানকার অবরুদ্ধ সেনাদের সম্রাট আকবরের পক্ষ থেকে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই শর্তে উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ফলে খান্দেশ সুলতান বাহাদুর শাহকে আটক করে দিল্লিতে নিয়ে যায় এবং খান্দেশ ও তার রাজধানী বুরহানপুর অতি সহজেই আকবরের অধীনে চলে আসে। এটিই ছিল সম্রাট আকবরের জীবনের শেষ বিজয়।[১০]

কবির খান ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বাংলা সুবার ভাওয়াল পরগনায় বহমান তুরাগ নদের রাজাবাড়ি ঘাটে এসে পৌঁছান। পরবর্তীকালে এখানে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে এটি উত্তরখান নামক এলাকা হিসেবে পরিচিত। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সম্রাট আকবরের দেওয়া উত্তরখান মৌজা কবির খান জায়গির হিসেবে লাভ করেন। এরপর শাহি ফরমান নিয়ে তিনি এখানে বসতি শুরু করেন। তাঁর আগমন ও বসতি স্থাপন বিষয়ে এ দেশের যেসব গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, তার মাঝে মরহুম হাকিম হাবিবুর রহমান রচিত *আসুদেগানে ঢাকা* অন্যতম তথ্যবহুল গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি বলেন, 'কুর্মিটোলা স্টেশনের পূর্ব-উত্তরে কবির শাহের দরগাহ অবস্থিত। তাঁর পুরো নাম হলো কবির খান। তিনি খান্দেশ এবং শাহিবাগি অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে তাঁকে আটক করে এখানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তখন তাঁকে একটি ছোট জায়গিরের (ভূমি রক্ষণাবেক্ষণের মালিকানা) দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরদেরও বর্তমান উত্তরখান মৌজায় বসতি রয়েছে।'[১১] ভাওয়াল অঞ্চলকে পরগনা হিসেবে মুসলমানরা সৃষ্টি করলেও এটি অধিকাংশ সময়েই হিন্দুদের অধীনে ছিল। তাই এ পরগনার উন্নতি ও জমিদারি বিস্তারে হিন্দু শাসক থাকায় এর অধিবাসীদের মাঝে

হিন্দুর সংখ্যা বেশি ছিল। তদুপরি এখানে বহুপূর্ব থেকেই ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আসা-যাওয়া ও বসবাস রয়েছে।[১২] কবির খানের জীবদ্দশায় এখানে জমিদারি করা ও মোগল শাসনের আনুগত্যের ব্যাপারে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। কবির খানের মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদের মধ্যে কায়সার খান জমিদারির দায়িত্ব পালন করেন। কবির খানের পরিবারের সংরক্ষিত ফারসি দলিলের ভাষ্যমতে কায়সার খানের জমিদারির দায়িত্ব পালন খুব একটা সুখময় ছিল না। ভাওয়াল জমিদারদের অবিরাম জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ১৬৫৬ সালে সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে বাংলা সুবার নাজিম বা প্রধান প্রশাসক খানবাহাদুর সুজাউদ্দৌলা শাহসুজার সময়ে এখানে দুই পক্ষের মামলা আমলে নিয়ে বিচার করে একটি রায় দেওয়া হয়েছিল (রায়ের কপি সংযুক্ত-১)। ১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের সময়ে আরেকটি মামলার রায়ে মুতাসুদ্দৌলা খানবাহাদুর (সুজাউদ্দৌলা সুজা উদ্দিন মোহাম্মদ খানবাহাদুর) কবির খানের বংশধরদের কাছে সেই মৌজার দায়িত্ব অর্পণ করেন (রায়ের কপি সংযুক্ত-২)। এগুলো এখন পর্যন্ত কবির খানের পরিচয়ের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। মোগল সম্রাটের শাসনামলে কবির খানের জায়গির নিয়ে তাঁর বংশধরদের কোনো সংকটে পড়তে হয়নি। তবে কখন কীভাবে তাঁদের জমিদারি হাতছাড়া হয়, তার কোনো সঠিক ইতিহাস জানা নেই। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী সময়ে ভাওয়াল পরিবার আশপাশে বহু জমিদারি বা জমি ক্রয় করে একটি বিরাট জমিদারির মালিক হয়। ১৮৫১ সালে জেমস ওয়াইজের জমিদারি ভাওয়াল এস্টেট কিনে নেয়। এই ক্রয়ের মাধ্যমে পরিবারটি সম্পূর্ণ ভাওয়াল পরগনার মালিক হয়ে যায়। সরকারি রাজস্ব নথিপত্র থেকে জানা যায়, ভাওয়ালের জমিদার ৪,৪৬,০০০ (চার লাখ ছেচল্লিশ হাজার) টাকা দিয়ে ওয়াইজের জমিদারি ক্রয় করেন। ১৮৭৮ সালে ভাওয়াল জমিদার কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি লাভ করেন।'[১৩] সেই সময় থেকে ভাওয়াল পরিবারের জমিদারির মর্যাদা রূপান্তরিত হয় রাজপরিবারে। তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর আমলে জমিদারি বিস্তৃত হয় ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ (বর্তমানে বরিশাল) জেলায়। তাই ধারণা করা হয়, ১৭৯৩—১৮৫১ সালের কোনো এক সময়ে কবির খানের বংশধরদের কাছ থেকে তাঁদের জমিদারি বেহাত হয়।

কবির খানের ইন্তেকালের সঠিক কোনো সাল, তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান করা হয়, তিনি ১৬৪৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১৪] কবির খানের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিকে ঘিরে তাঁর ভক্তগণ একটি মাজার তৈরি করেন, যা কবির শাহের দরগাহ নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে তাঁর দরগাহকেন্দ্রিক একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেন (প্রতিষ্ঠাকাল অজ্ঞাত)। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরই এক বংশধর আবদুর রাকিব খান পিতা আব্দুল লতিফ খান মাজারসংলগ্ন জমিগুলোর ওয়াক্‌ফ এস্টেটে

রেজিস্ট্রেশন করেন। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে একটি কওমি মাদ্রাসা ও বর্তমানে বড় পরিসরে মসজিদ কমপ্লেক্সের কাজ শুরু হয়েছে।

সংযুক্তি-১ (ফারসি ভাষার দলিল এবং এর বাংলা অনুবাদ)

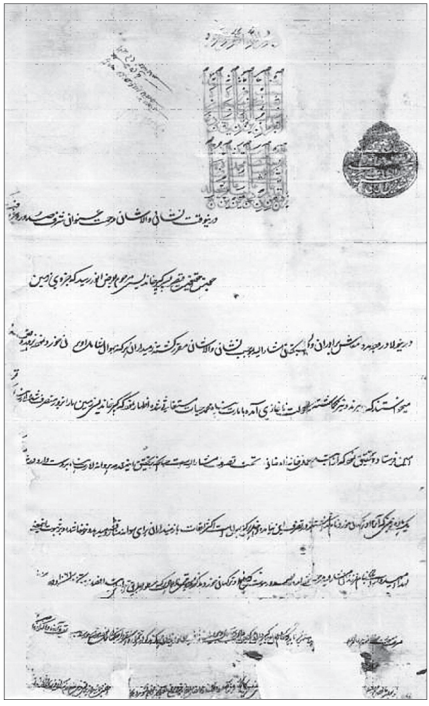

অদ্যকার এ সময়ে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উপরোক্ত বিষয়টি সমাধানের নিমিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল :

মরহুম কবির খান্দেশির পুত্র কায়সার জনাব আনোয়ার রশীদ বরাবর আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করলেন যে তাঁর (কায়সারের) পরিবার-পরিজন ও ভাইদেরকে নিয়ে এই উত্তরখান মৌজা তাঁদের বসবাসের জন্য বাদশাহ আকবরের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভাওয়াল জমিদারগণ তাঁদেরকে সেখান থেকে জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে উৎখাত করতে চান। [অন্যদিকে] তাঁরা (ভাওয়াল জমিদারগণ) ও তাঁদের লোকজন, সম্পদ রক্ষা ও সমূহ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সরকারের কাছে মোহাম্মদ হায়াতের মাধ্যমে সাহায্য চাইলেন এবং অভিযোগ করলেন, কবির খান্দেশি (গং) অন্যায়ভাবে আমাদের জমি দখল করে রেখেছেন। উভয় পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে একজন আমিন প্রেরণ করা হলো। সব তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাচাইপূর্বক তাঁদের সবার জন্য সরকারি আদেশ ঘোষণা করা হলো।

ওই আদেশে জানানো হলো যে কায়সার (গং)-এর দখলে উত্তরখান নামীয় মৌজাটি ভাওয়াল পরগনার অন্তর্ভুক্ত, যা নিয়ে অধিকাংশ সময়ই উভয় পক্ষ একে অপরের সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদে রক্ত ঝরানোর ঘটনাও ঘটিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। তাই সরকারের পক্ষ থেকে কবির খানের দখলে থাকা ভাওয়াল পরগনায় উত্তরখান মৌজা তাঁদের বসবাস ও মালিকানা ঘোষণাপূর্বক ১০৬৬ হিজরিতে বিবাদ মীমাংসা করতে নির্দেশ দেওয়া হলো।

ভাওয়াল পরগনার উত্তরখান মৌজার ব্যাপারে সম্পাদিত চুক্তিনামা সরকারের প্রশাসক, কর্মচারী, বর্তমানে জায়গিরপ্রাপ্ত ও জমিদারগণ সবাইকেই মেনে চলার জন্য আদেশ করা হলো।

সংযুক্তি-২ (ফারসি ভাষার চুক্তিনামা এবং এর বাংলা অনুবাদ)

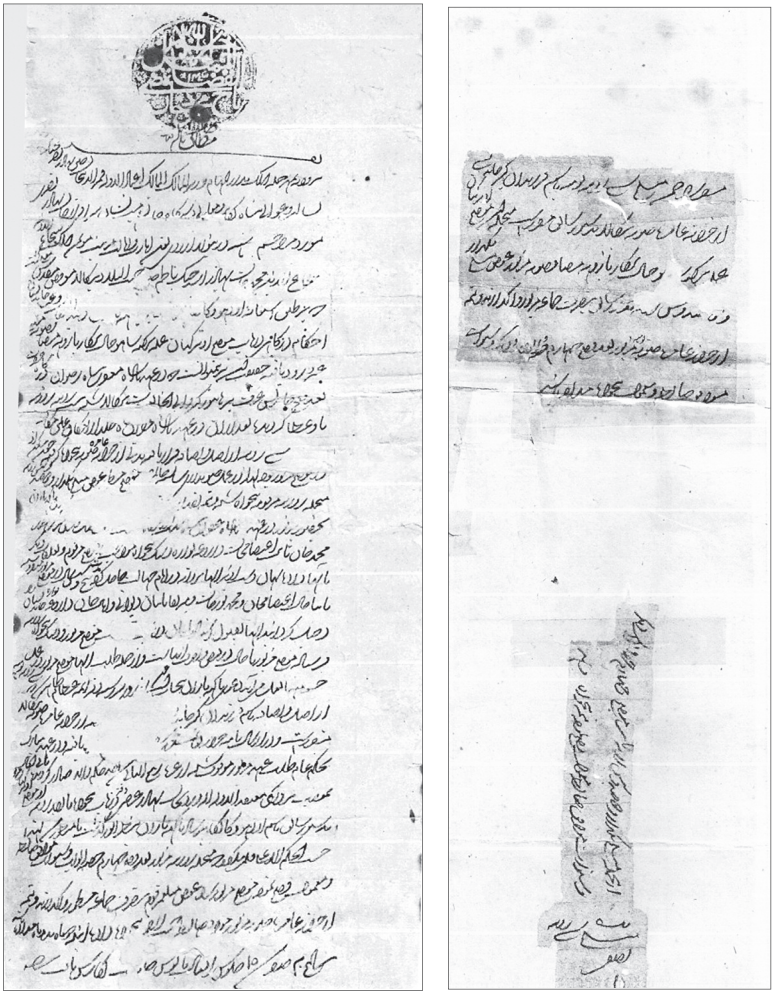

(সিলমোহর) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.), কাজিউল কুজাত (বিচারকদের বিচারক) তাজুল মাইমানাত (সৌভাগ্যের মুকুট) মাহমুদ খান, ১১৪৪ হিজরি।

চুক্তিনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

রাষ্ট্রীয় সিল মোহরাঙ্কিত উল্লিখিত চুক্তিনামা চতুর্থ দিনে সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিনামা উজিরে আল মামালিক (রাষ্ট্রের মন্ত্রী) আল মামালিক এতেমাদুদ্দৌলা কামরুদ্দিন খান বাহাদুর ও ভারপ্রাপ্ত সুবেদার সার আফরাজ খানের সহায়তা এবং ভূস্বর্গ বাংলা সুবার প্রধান প্রশাসক মুতমান উল মূলক সুজাউদ্দৌলা সুজা উদ্দিন মোহাম্মদ খান বাহাদুর আসাদে জং এঁদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় উত্তরখান মৌজার এই দলিল সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্রাট আকবরের সময়কালে খান্দেশ ওরফে বুরহানপুর নামক অঞ্চল বিজয়ের পর এই অঞ্চলের প্রধান প্রশাসক দৈনিক বিশ রুপি অর্থ প্রদানের বিনিময়ে কবির খান্দেশিকে উত্তরখান মৌজা দান করেন।

পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহজাহান (পানাহে খালাদুল্লাহ) কবির খানের বসবাস ও জীবনযাপনের জন্য উক্ত মৌজার খাজনা দৈনিক ত্রিশ রুপিতে উন্নীত করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এ ভূমির নির্দিষ্ট খাজনা পরিশোধ করে আসছিলেন। তিনি (বাদশাহ শাহজাহান) বসবাসকৃত এ জমির খাজনা আদায়ের জন্য একজন সুবেদার নিযুক্ত করেন। নতুন সুবেদার দ্বিতীয় মোহাম্মদ খান (মুর্শিদ কুলি খান) ও এতেসাম খান দারোগা পূর্বনির্ধারিত খাজনার পরিমাণ পরিবর্তন করে মাসিক ১২০৬ (এক হাজার দুই শত ছয়) রুপি নির্ধারণপূর্বক আদায় করেন। দ্বিতীয় মোহাম্মদ খান (মুর্শিদ কুলি খান) ও এতেসাম খান দারোগা অন্যায়-অবিচারের মাধ্যমে পাঁচ-ছয় বছর ধরে এ পরিমাণ অর্থ আদায় করেন। পরবর্তীকালে এতেসাম খান, মোহাম্মদ নুর খান ও অর্থ বিভাগের কর্মচারীর যোগসাজশে উপরোক্ত পরিমাণ খাজনা আদায় করে তাঁরা আদায়কৃত অর্থের কিছু পরিমাণ রুপি শাহি কোষাগারে পাঠানো অব্যাহত রাখেন।

উল্লিখিত মৌজাটি নিজেদের আয়ত্তে রাখার জন্য তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যক্রম শুরু করেন। এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক কবির খান্দেশির কাছ থেকে বাদশাহ প্রদত্ত দৈনিক ত্রিশ রুপি অর্থ প্রদানে মৌজা জায়গির দেওয়ার ফরমানের পত্রটি এবং খাজনা জমা দেওয়ার রশিদ দেখে আগের সব বাকি খাজনা স্থগিত করে রবিউসসানি মাসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সামনে নতুন আদেশ জারি করেন। আগের দেওয়া বাদশাহর আদেশকে সমুন্নত রেখে মুতাসুদ্দৌলা খান বাহাদুর (সুজাউদ্দৌলা সুজা উদ্দিন মোহাম্মদ খান বাহাদুর) কবির খানের বংশধরদের কাছে উক্ত মৌজার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী আগের নির্ধারিত খাজনা বহাল রেখে সরকারি আদেশ প্রদান করা হয় এবং উপরোক্ত মৌজার পরিবর্তিত ও পরিশোধিত খাজনা আদায় এবং পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে আগামী দুই মাসের জন্য সেখানে সৈন্য নিয়োগ করা হলো।

সফর মাসের শেষ সপ্তাহের শালিশি বৈঠকে এ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হলো। এই চুক্তিনামায় আরও স্পষ্ট করে বলা হলো, দৈনিক ত্রিশ রুপি খাজনার বিনিময়ে কবির খান্দেশির বংশধরদের নামে পূর্বের শর্তানুযায়ী পুনরাদেশ প্রদান করা হলো।

উল্লিখিত আদেশ বর্তমানে ভাওয়াল পরগনার অধীন উত্তরখান মৌজার সুবেদার কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক সনদ নবায়ন বাবদ ১০০০/-(এক হাজার) রুপি প্রদানের আদেশ রহিত করা হলো। মাসিক ১২০৬/-(এক হাজার দুই শত ছয়) রুপির চতুর্থ হিস্যা পরিশোধপূর্বক উক্ত আদেশটিও রহিত করা হলো। তবে আগের অনাদায়ি অবশিষ্ট অর্থের অর্ধেক হিস্যা হিসেবে ত্রিশ রুপি আদায়ের নির্দেশ দেওয়া গেল।

তথ্যসূত্র

১. Mohd. Siraj Anwar, *Mughal Relation with The State of Khandesh*, M.Phil Thesys, Aligarh Muslim University, Aligarh 1190. p.120.

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ-১৪তম খণ্ড*, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৭৪৫।

৩. Mohd. Siraj Anwar, 1190. p.102.

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ-৯ম খণ্ড*, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৫১৩।

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ-৯ম খণ্ড*, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৫১৪।

৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ-১৪তম খণ্ড*, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৭৪৫।

৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ-৯ম খণ্ড*, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৫১৩।

৮. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া -১ম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা ২০১১, পৃ. ১২৪।

৯. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, বড়াল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২৩৮।

১০. এ কে এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ২৪৪।

১১. হাকিম হাবিবুর রহমান, *আসুদেগানে ঢাকা*, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা ১৯৪৬, পৃ. ১২৩, ১২৪।

১২. জেমস টেলর (অনু : মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান), *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৭০।

১৩. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া -১০ম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ঢাকা ২০১১, পৃ. ১১৯।

১৪. মতিয়ার রহমান সিদ্দিকী, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী পুনর্মিলনী ১৯৯২, উত্তরখান ইউনিয়ন বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা ১৯৯২। পৃ. ৩১।

লেখক পরিচিতি

আকবর আলি খান

আকবর আলি খান। জন্ম : ১৯৪৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে বিএ অনার্স ও এমএ এবং কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ ও পিএইচডি। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তানের সামরিক আদালত তাঁর অনুপস্থিতিতে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানের সদস্য ছিলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭। জনপ্রিয় প্রকাশনা : *Discovery of Bangladesh; Friendly Fires, Humpty Dumpty Disorder and Other Essays; Gresham's Law Syndrome and Beyond; পরার্থপরতার অর্থনীতি; আজব ও জবর আজব অর্থনীতি; দারিদ্র্যের অর্থনীতি : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; চাবিকাঠির খোঁজে; দুর্ভাবনা ও ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে;* এবং *বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*।

আলী রীয়াজ

লেখক ও গবেষক। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো। তিনি ২০০৭ সাল থেকে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ২০০২ সালে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড ও সাউথ ক্যারোলাইনায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি লন্ডনে বিবিসিতে সাংবাদিকতা করেছেন পাঁচ বছর। ২০১৩ সালে ড. রীয়াজ ওয়াশিংটনের উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলারসে পাবলিক পলিসি স্কলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনীতি, মাদ্রাসাশিক্ষা, রাজনৈতিক ইসলাম এবং সহিংস উগ্রবাদ। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *আনডায়িং ইস্যুজ* (২০১৮), *লিভড ইসলাম অ্যান্ড ইসলামিজম ইন বাংলাদেশ* (২০১৭), *বাংলাদেশ : আ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি সিনস ইনডিপেনডেন্স* (২০১৬)। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর

অন্যতম গ্রন্থ হলো *ভয়ের সংস্কৃতি : বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি* (২০১৪)।

নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রিটেনের সিটি ইউনিভার্সিটি লন্ডন থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে পিএইচডি করেছেন। বাংলাদেশের বেসামরিক নিরাপত্তা শাসনব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় অ্যাক্টরদের ভূমিকা কী ধরনের প্রভাব রাখে, সেটিই তাঁর গবেষণার মূল বিষয়। *Providing Peacekeepers : The Politics, Challenges and, Future of United Nations Peacekeeping Contributions* (Oxford : Oxford University Press, 2013) গ্রন্থে তাঁর একটি অধ্যায় রয়েছে। এ ছাড়া তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা জার্নালে লিখেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় : সিভিল সোসাইটি, নিরাপত্তা শাসনব্যবস্থা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষিণ এশিয়ার প্রদায়ক দেশগুলোর ভূমিকা।

আলতাফ পারভেজ

স্বাধীন গবেষক হিসেবে কাজ করছেন। পড়েছেন দর্শনশাস্ত্রে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে আগ্রহী দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত *রাষ্ট্রচিন্তা*, *প্রতিচিন্তা*, *নতুন দিগন্ত*, *সংস্কৃতি*, *সর্বজনকথা* ইত্যাদি জার্নালে লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ১৫। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে *গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা* (প্রথমা); *মিঞা অসমিয়া এনআরসি* (প্রথমা); *যোগেন মণ্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ* (প্রথমা), *শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম্ ও দক্ষিণ এশিয়ায় জাতি-রাষ্ট্রের সংকট* (ঐতিহ্য), *বার্মা : জাতিগত সংঘাতের সাত দশক* (ঐতিহ্য)।

হাফিজুর রহমান কার্জন

শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর তিনি সুইজারল্যান্ডের ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইনস্টিটিউট থেকে আন্তর্জাতিক আইন ও অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *হ্যান্ডবুক অব ক্রিমিনোলজি*, *ক্রিমিনাল জাস্টিস*, *ভিক্টিমোলজি অ্যান্ড রেস্টোরেটিভ জাস্টিস*। পাবলিক ও

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান করা ছাড়াও তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক ও অতিথি বক্তা হিসেবে বিসিএস একাডেমি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জেনোসাইড স্টাডিজ, পুলিশ স্টাফ কলেজ ও আনসার একাডেমিতে পড়ান। তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন পত্রিকায় কলাম লেখেন।

আবুল বাশার

মোহাম্মদ আবুল বাশার ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ও উর্দু বিভাগ থেকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে বিএ (সম্মান) এবং ২০০০ সালে একই বিষয়ে এমএ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। ২০১৮ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১২ সালে তিনি ইরান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ইরানের ইমাম খোমেনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ফারসি ভাষায় উচ্চতর কোর্স কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। তাঁর ফারসি ভাষায় ২টি ও বাংলায় ১টি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ফারসি-বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, অনুবাদ ও চরিত সাহিত্য এবং ফারসি পাণ্ডুলিপির ওপর কাজ করে থাকেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের গ্রন্থাগারিক পদে কর্মরত আছেন।

পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিন যেমনটা আপনার চাই

আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারাবাহিকতায়
এক্সিম ব্যাংকের

আকর্ষণীয় আমানত হিসাবসমূহ

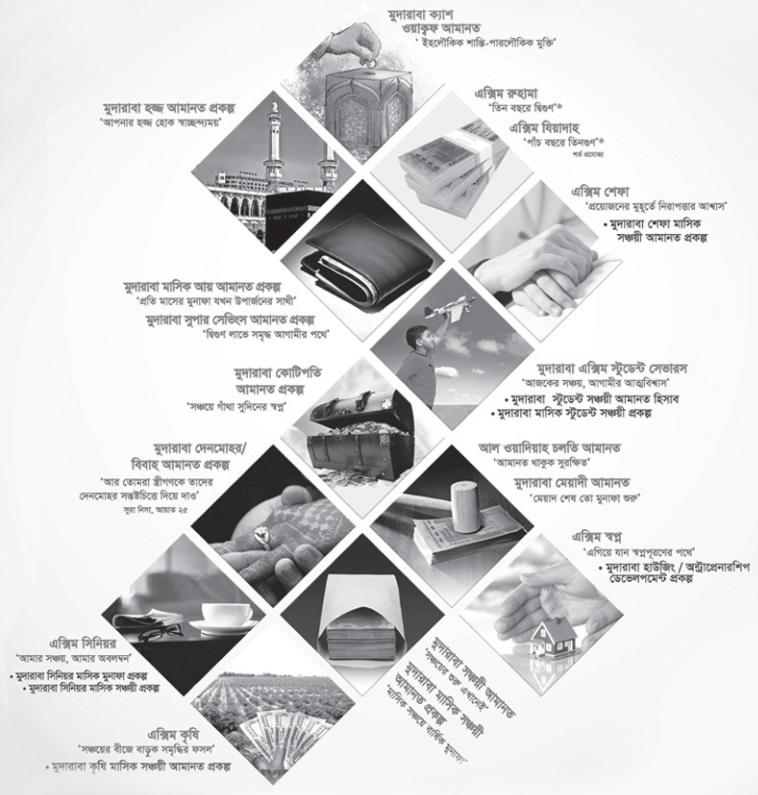

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ আমানত
' ইহলৌকিক শান্তি-পারলৌকিক মুক্তি'

মুদারাবা হজ্জ আমানত প্রকল্প
'আপনার হজ্জ হোক স্বাচ্ছন্দ্যময়'

এক্সিম রুহামা
'তিন বছরে দ্বিগুণ'*

এক্সিম যিয়াদাহ্
'পাঁচ বছরে তিনগুণ'*
শর্ত প্রযোজ্য

এক্সিম শেফা
'প্রয়োজনের মুহূর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস'
• মুদারাবা শেফা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

মুদারাবা মাসিক আয় আমানত প্রকল্প
'প্রতি মাসের মুনাফা যখন উপার্জনের সাথী'

মুদারাবা সুপার সেভিংস্ আমানত প্রকল্প
'দ্বিগুণ লাভে সমৃদ্ধ আগামীর পথে'

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'
• মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী আমানত হিসাব
• মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা কোটিপতি আমানত প্রকল্প
'সঞ্চয়ে গাঁথা সুদিনের স্বপ্ন'

মুদারাবা দেনমোহর/ বিবাহ আমানত প্রকল্প
'আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও'
সূরা নিসা, আয়াত ২৫

আল ওয়ালিয়াহ্ চলতি আমানত
'আমানত থাকুক সুরক্ষিত'

মুদারাবা মেয়াদী আমানত
'মেয়াদ শেষে তো মুনাফা শুরু'

এক্সিম স্বপ্ন
'এগিয়ে যান স্বপ্নপূরণের পথে'
• মুদারাবা হাউজিং / অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

এক্সিম সিনিয়র
'আমার সঞ্চয়, আমার অবলম্বন'
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক মুনাফা প্রকল্প
• মুদারাবা সিনিয়র মাসিক সঞ্চয়ী প্রকল্প

মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
'সঞ্চয়ের শুরু এখানেই'

মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প
'মাসিক সঞ্চয়ে বার্ষিক মুনাফা'

এক্সিম কৃষি
'সঞ্চয়ের বীজে বাড়ুক সমৃদ্ধির ফসল'
• মুদারাবা কৃষি মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প

**এক্সিম ব্যাংকের সকল হিসাব শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ায় মুনাফার হার কম/বেশি হতে পারে

EXIM BANK
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

www.eximbankbd.com

সবধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

www.fsiblbd.com
সবার জন্যে সবসময়
করোনাকালীন সময়ে
হিসাব খুলুন ফ্রিডমে
ব্যাংকিং করুন ক্লাউডে
ঘরে বসেই উপভোগ করুন সকল প্রকার
ব্যাংকিং সেবা
ওয়াসা
DESCO
DPDC
টেলিটক
নগদ
রবি
FSIB ISLAMI BANK
CLOUD
FREEDOM
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, ডিজিটাল ব্যাংকিং-এ আস্থা রাখুন, করোনা ঝুঁকিমুক্ত থাকুন।
Downlord FSIBL Cloud
ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store
Call Center 16257 24/7
FSIB ISLAMI BANK
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
فارست سيكيوريتى اسلامى بنك ليميتد FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.

সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী উদ্যোগ

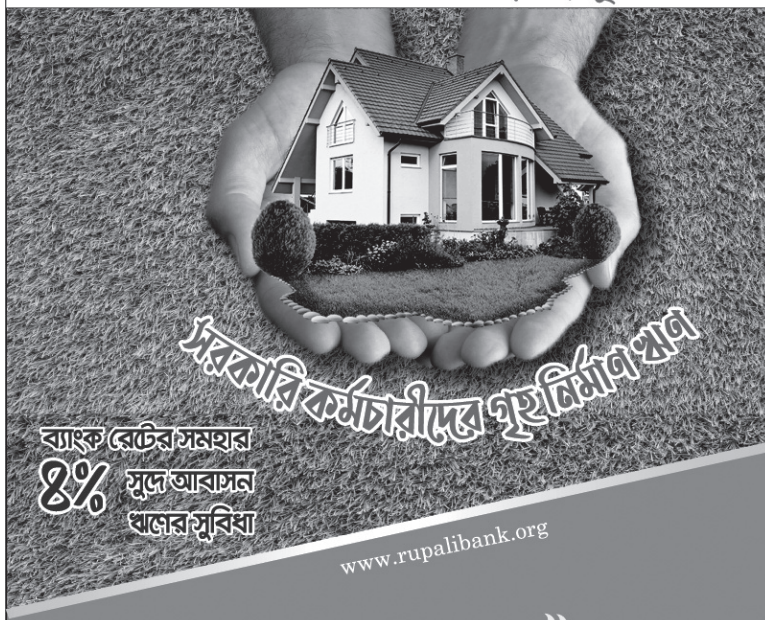

সরকারি কর্মচারীদের বহুল প্রত্যাশিত আবাসন ঋণ এখন আপনার সুবিধামত রূপালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে গ্রহণ করতে পারেন।

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং

ক্র.নং	বেতন গ্রেড / স্কেল	ঢাকা মহানগরী/ সকল সিটি কর্পোঃ/ বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
০১	৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদূর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
০২	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
০৩	১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১,০০০/- হতে ১৬,০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
০৪	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
০৫	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

*ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট ইকুইটি রেশিও হবে ৯০ঃ১০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.org

YAMAHA
Revs Your Heart

ACI Motors

ALL-ROUNDER IN 125CC

MILEAGE. POWER. STYLE

SALUTO
125CC

MILEAGE
78
KM/L
* On Standard Test Condition

AVAILABLE IN
ARMADA BLUE | MATT GREEN

Features

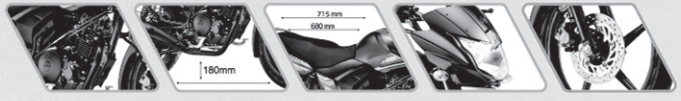

125cc Blue Core Engine | High Ground Clearance | Wide & Comfortable Seat | Stylish Front Parking Light | 245mm Disc Brake

HOT LINE 16533

BLUE CORE FUN & ECO

/yamahabd

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে প্রতিচিন্তার গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। এ ছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও গ্রাহক হওয়া যাবে (বিকাশ নম্বর : ০১৯৫৫৫৫২০৬৯)। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ৪০০ (চার শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮০০ (আট শ) টাকা ও ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে),
গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬